গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৯ বর্ষ ১৩ সংখ্যা ১০ - ১৬ নভেম্বর ২০০৬ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

মার্কিন হুকুমে এই রায় সাদ্দাম হুসেনকে খুন করারই চক্রান্ত

এস ইউ সি আই কেন্দ্রীয় কমিটি

আন্তর্জাতিক দস্যুসর্দার মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হুকুমে ইরাকের পুতুল সরকার যেভাবে সাজানো বিচারের মধ্য দিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হুসেনকে মৃত্যু দণ্ডাদেশ দিয়েছে তাকে চরম স্বৈরতান্ত্রিক আখ্যা দিয়ে এস ইউ সি আই সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী ৫ নভেম্বর এক বিবৃতিতে ধিক্কার জানিয়েছেন। তিনি জোরের সাথে বলেন যে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী দস্যুরা যারা ইরাকের তৈলক্ষেত্র এবং অন্যান্য সমস্ত সম্পদ দখল করার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র হাসিল করতে ভয়ানক মারণাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আন্তর্জাতিক রীতিনীতি দু'পায়ে মাড়িয়ে অবৈধভাবে আক্রমণ করে ইরাককে দখল করেছে, নির্মমভাবে হাজার হাজার নিরীহ ইরাকি নাগরিককে হত্যা করেছে, ইরাকের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে ধ্বংস করেছে, তাদের কোন অধিকারই নেই ইরাকের প্রেসিডেন্টকে বিচার করার এবং শাস্তি দেওয়ার। তিনি বলেন, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা গঠিত এবং পরিচালিত বিচারালয়ের এই রায়কে বাস্তবে সাদ্দাম হুসেনকে খুন করার প্রকাশ্য ঘোষণা ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। তিনি আরও বলেন, ইরাকের বীর জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামকে বর্বর এবং নৃশংস অত্যাচার চালিয়েও স্তব্ধ করতে ব্যর্থ হয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ দখলদারি টিকিয়ে রাখার শেষ চেষ্টা হিসাবে সাদ্দাম হুসেনকে হত্যা করার পথ নিয়েছে।

সাদ্দাম হুসেন এবং তাঁর বীর সহযোদ্ধাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া এই ফ্যাসিস্ট মৃত্যুদণ্ডাদেশ অবিলম্বে বাতিলের দাবি জানিয়ে কমরেড নীহার মুখার্জী বিশ্বের স্বাধীনতাপ্রিয় জনগণের কাছে মার্কিন মদতপুষ্ট এই পৈশাচিক ষড়যন্ত্র বানচাল করার এবং ইরাকের মাটি থেকে মার্কিন দখলদারদের তাড়াতে ইরাকি জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামকে শক্তিশালী করার জন্য এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন।

মার্কিন হুকুমে সাদ্দাম হুসেনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার প্রতিবাদে ৬ নভেম্বর কলকাতায় এস ইউ সি আই-এর বিক্ষোভে জর্জ বুশের কুশপুতুল পোড়ানো হচ্ছে

কৃষকের জমি রক্ষার লড়াইয়ে এস ইউ সি আই শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে থাকবে

সিঙ্গুরের বিশাল সমাবেশে কমরেড প্রভাস ঘোষ

'এত মানুষ! এত বিশাল মিছিল!' ৩ নভেম্বর সিঙ্গুরবাসী চাষী-মজুর-সাধারণ মানুষের চোখে-মুখে ছিল অপার বিস্ময়। মিছিলের পাশে দাঁড়িয়ে প্রবল আবেগে একজন যখন এমন বিস্ময় প্রকাশ করছে, অন্যজন তখন তাকে বিস্তীর্ণ সবুজ ধানখেতের ওপারে আর একটা বিশাল মিছিলের সারি দেখিয়ে বলছে, ঐ দেখো, আরও যাচ্ছে। সত্যিই, এত বিশাল মিছিল এবং হাজার হাজার মানুষের এমন বিরাট সমাবেশ ইতিপূর্বে সিঙ্গুরের মাটিতে মানুষ দেখেনি। এদিন এস ইউ সি আইয়ের ডাকে দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলা থেকে চাষী, খেতমজুর, কলকারখানার শ্রমিক, শহরের ছাত্র-যুব-মা-বোনেরা হাজারে হাজারে হাজির হয়েছিল সিঙ্গুরে। চাষীদের থেকে কৃষিজমি কেড়ে নিয়ে টাটা কোম্পানির হাতে তুলে দেবার সিপিএম সরকারের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে এবং পুলিশি অত্যাচারে আহত-ক্ষতবিক্ষত হয়েও সিঙ্গুরের চাষী-মজুর-সাধারণ মানুষ গত ৬ মাস ধরে যে প্রতিরোধ সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে, সেই সংগ্রামের প্রতি সংহতি জানাতেই আয়োজিত হয়েছিল এই সমাবেশ। বারুইপুর সহ দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বিস্তীর্ণ এলাকা, নন্দীগ্রাম সহ মেদিনীপুরের বিভিন্ন এলাকা, হাওড়া, নদীয়া প্রভৃতি এলাকার সাধারণ চাষীরা, যারা নিজ নিজ এলাকায় কৃষিজমি কেড়ে নেওয়ার সরকারি চক্রান্তের বিরুদ্ধে লড়ছে, সংগ্রামী কমিটি গড়ে তুলেছে, এসেছিল তারাও। ৩ নভেম্বর সকালেই পৌঁছে ঘুরে ঘুরে তারা সংগ্রামী চাষীদের সঙ্গে মত বিনিময় করে তাদের অভিজ্ঞতা শুনে নিজেরাও সমৃদ্ধ হয়েছে, নিজেদের এলাকায় সংগ্রাম কমিটিগুলিকে আরও শক্তিশালী করে প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তোলার উত্তাপ সংগ্রহ করেছে সারাদিন ধরে। সিঙ্গুরের প্রতিরোধ সংগ্রাম রাজ্যের সকল লড়াকু কৃষকদের কাছে মডেল। তাদের কেউ কেউ ঠিক করেছে, নিজ নিজ অঞ্চলের সংগ্রাম কমিটির সদস্যদের তারা সিঙ্গুরে এনে ঘুরিয়ে নিয়ে যাবে, যাতে তারা প্রেরণা লাভ করতে পারে।

বামপন্থী নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গের জেলায় জেলায় কৃষক খেতমজুররা এক সময় জোতদারের বিরুদ্ধে এবং তাদের এজেন্ট কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আন্দোলন করত, দাবি তুলত— চাষীর হাতে জমি চাই, লাঙ্গল যার জমি তার, বেনাম জমি উদ্ধার করে চাষীদের মধ্যে বিলি করতে হবে, বর্গাদারদের স্বীকৃতি দিতে হবে, খেতমজুরদের ন্যায্য মজুরি দিতে হবে। আর আজ সিঙ্গুর সহ জেলায় জেলায় কৃষক আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে সিপিএম সরকার কর্তৃক চাষীর জমি কেড়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে। এখন চাষীর শত্রু সিপিএম সরকার নিজে এবং এই সরকার যাদের এজেন্ট হিসেবে কাজ করছে সেই টাটা, সালিম, আম্বানি সহ দেশি-বিদেশি বহুজাতিক কোম্পানিগুলো। যে জমি চাষী ও চাষী পরিবারের ভাত-কাপড়ের জোগান দেয়, তাদের চিকিৎসা ও

ছয়ের পাতায় দেখুন

৩ নভেম্বর সিঙ্গুরে বিশাল সমাবেশের একাংশ

সল্টলেকে গুলি চালনার ঘটনা প্রসঙ্গে
জেলাশাসকের রিপোর্ট বাতিলের দাবি জানালো অ্যাবেকা

২০০৫ সালের ২৭ অক্টোবর সল্টলেকে বিদ্যুৎ ভবনের সামনে বিদ্যুৎগ্রাহকদের উপর নির্বিচারে পুলিশের গুলি, কাঁদানে গ্যাস, লাঠি চালনার ঘটনা প্রসঙ্গে ১ নভেম্বর রাজ্য মানবাধিকার কমিশনে শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। শুনানিতে অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সঞ্জিত বিশ্বাস, সাধারণ সম্পাদক অমল মাইতি সহ প্রতিনিধিগণ উপস্থিত হয়ে বক্তব্য রাখেন। নেতৃবৃন্দ বলেন, উত্তর ২৪ পরগণার জেলাশাসক যে তদন্ত রিপোর্ট কমিশনের কাছে পেশ করেছেন তা সম্পূর্ণভাবে একপেশে এবং পুলিশের দেওয়া বিবৃতি অনুযায়ী তৈরি। এর ভিত্তিতে নিরপেক্ষ বিচার হওয়া সম্ভব নয়। সেই কারণে আজকের শুনানি স্থগিত রেখে অভিযুক্ত পুলিশ অফিসারগণ এবং উক্ত জেলাশাসককে উপস্থিত করিয়ে প্রকাশ্য শুনানির ব্যবস্থা করা দরকার, অথবা কমিশন নিজে উক্ত ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে দোষীদের শাস্তি ও আহতদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করুন। ঐ ঘটনায় গুরুতর আহত খোদ্দার সেখ আলাদা একটি আবেদনপত্র কমিশনে জমা দিয়ে উপযুক্ত বিচার এবং ক্ষতিপূরণ দাবি করেন। অ্যাবেকার এই বক্তব্যের ভিত্তিতে রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি শ্যামল সেন এই দিনের মতো শুনানি স্থগিত রেখে ৮ নভেম্বর চূড়ান্ত শুনানির দিন স্থির করেন এবং অন্যান্য আহতরাও তাঁদের ব্যক্তিগত আবেদন এক সপ্তাহের মধ্যে পেশ করতে পারবেন বলে তাঁর নির্দেশে জানান।

সমস্ত গ্রামে বিদ্যুতায়নের দাবিতে বারুইপুরে বিক্ষোভ

বিদ্যুৎবিহীন সমস্ত গ্রামে অবিলম্বে বিদ্যুৎ সরবরাহের দাবিতে গত ৩০ অক্টোবর বারুইপুরে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের প্রোজেক্ট ম্যানেজার আর ই-৮ এর দপ্তরে এস ইউ সি আই-এর উদ্যোগে সহস্রাধিক মানুষ বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। কমরেড গোবিন্দ হালদারের নেতৃত্বে কমরেড সুজাতা ব্যানার্জী, ইয়াহিয়া আখন্দ, রেণুপদ হালদার, কমল পাণি, রঞ্জিত বায়েন, সমীরশেখর নাইয়াকে নিয়ে গঠিত প্রতিনিধি দল একটি স্মারকলিপি ম্যানেজারের নিকট পেশ করে। কমরেড গোবিন্দ হালদার বলেন, ২০০৭ সালের মধ্যে সমস্ত গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহের সরকারি ঘোষণা প্রহসনে পরিণত হতে চলেছে। ঘোষিত সময়সীমার মধ্যে বিদ্যুতায়নের কাজ সম্পন্ন না হলে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কমরেডস সুনীল মণ্ডল, দিব্যেন্দু মুখার্জী, জয়দেব সরকার ও বাসুদেব ব্যানার্জী।

বন্যাত্রাণে দুর্নীতির বিরুদ্ধে ও ১০০ দিনের কাজের দাবিতে
গোসাবায় বিডিও ডেপুটেশন

গত ২৭ অক্টোবর সারা ভারত কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের ডাকে গোসাবা বিডিও'র কাছে বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন সংগঠিত হয়। প্রায় শতাধিক মানুষ গোসাবার প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলি থেকে ১২-১৫ কিমি পথ হেঁটে এসে এই বিক্ষোভ সমাবেশে সামিল হন। ঝড়ে ঘর না ভাঙলেও দলীয় রং দেখে তাদের ক্ষতিপূরণের টাকা দেওয়া হয়েছে, অথচ হাজার হাজার গরিব মানুষ যাদের বাড়িঘর একেবারে ধ্বংস হয়ে গেছে, দলীয় সমর্থক না হওয়ায় তারা একটি টাকাও ক্ষতিপূরণ পায়নি। ঝড়ে উপড়ে যাওয়া রাস্তার গাছ নিয়ে, পলিথিন সাহায্য দেওয়া নিয়ে অঞ্চলে অঞ্চলে ব্যাপক দুর্নীতি ঘটেছে। এইসব দুর্নীতির তদন্ত ও প্রতিকারের দাবি, রেশন কার্ড, কেরোসিন তেল, ১০০ দিনের কাজ ও এসসি, এসটি এবং ওবিসি সম্প্রদায়ের সার্টিফিকেট সহজ উপায়ে পাওয়া প্রভৃতি নিয়ে মানুষ এসেছিল ডেপুটেশনে। অন্য দলের সমর্থক বহু মানুষও এই কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে যোগ দেন। সকালে ১০ কিমি হেঁটে যখন মিছিল যায় তখন দু'পাশের লোক উচ্ছ্বসিত হয়েছেন এস ইউ সি আই-এর বৃদ্ধি দেখে এবং তাদের উৎসাহ দিয়েছেন। এই ডেপুটেশনে নেতৃত্বে ছিলেন কমরেড গৌতম দত্ত, তাপস সরকার ও চন্দন মাইতি। বিডিও অফিসে পৌঁছানোর পর সংক্ষিপ্ত সভায় স্মারকলিপি পাঠ করেন কমরেড বিকাশ শাসমল। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের থানা কমিটির উপদেষ্টা কমরেড নির্মল সরদার ও বিশ্বেশ্বর গিরি।

সমাবেশে উপস্থিত মহিলারা জব কার্ড, রেশন কার্ড ও বন্যাত্রাণ নিয়ে তাদের উপর ঘটে যাওয়া কাহিনী ঘরোয়া ভাষায় বিডিও'র উদ্দেশ্যে রাখেন। অনেকে বলতে গিয়ে কেঁদে ফেলেন। গোটা পরিবেশ ভারাক্রান্ত ও আরও বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। বিশেষ করে শ্রীমতী কবিতা খাড়ার বক্তব্য সবার মনে দাগ কাটে। উল্লেখ্য যে, বিডিও সমস্ত দাবি খুব সহানুভূতির সাথে মেনে নিয়েছেন ও সদর্থক ক্রিয়া করবেন বলে কথা দিয়েছেন। ত্রাণের দুর্নীতির অভিযোগ গ্রহণ করে নিখুঁত তালিকা দিতে বলেছেন। তিনি এই তালিকা ধরে নতুন করে এনকোয়ারি করাবেন। ডেপুটেশনের ফলাফল জানিয়ে অপেক্ষমান সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কমরেডস তাপস সরকার ও বিকাশ শাসমল।

এলাকার মানুষের নানা দাবিতে বাসন্তীতে বিডিও ঘেরাও

গত ২৬ অক্টোবর এস ইউ সি আই-এর বাসন্তী লোকাল কমিটির উদ্যোগে বাসন্তী ব্লকের সমস্ত গরিব মানুষের নাম বিপিএল তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা, ১০০ দিনের কাজ ও জব কার্ড, কাজ না দিলে মাসিক বেকারভাতা, মাথাপিছু ১ লিটার করে সরকারি মূল্যে কেরোসিন তেল, সাবস্টেশন চালু, প্রতি ঘরে বিদ্যুৎ, বাসন্তী বাজারে জল নিকাশি ব্যবস্থা ও বাসন্তীর ঝড়খালী অঞ্চলে পানীয় জলের টিউবওয়েল সারাই ইত্যাদি দাবিতে বাসন্তী বিডিও'র কাছে ডেপুটেশন ও ঘেরাও কর্মসূচি পালিত হয়। প্রায় শতাধিক মানুষ প্রায় ৫০ কিমি পথ অতিক্রম করে এই ডেপুটেশনে অংশগ্রহণ করেন। জয়েন্ট বিডিও প্রথমে মানতে না চাইলেও পরে শান্তভাবে সমস্ত দাবির যৌক্তিকতা স্বীকার করেন ও কয়েকটি দাবি সঙ্গে সঙ্গে মেনে নিয়ে কার্যকরী করার ব্যবস্থা নেন। সন্ধ্যাতে বাসন্তী ও সোনাখালী বাজারে এক উদ্দীপ্ত মিছিল হয় যার ব্যাপক প্রভাব পড়ে এলাকায় মানুষের উপর। পরের দিন বিভিন্ন ব্যক্তি এস ইউ সি আই কর্মীদের বাজারে অভিনন্দন জানিয়ে সংগঠন গড়তে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। ডেপুটেশনের নেতৃত্বে ছিলেন কমরেড বৈদ্যনাথ বর। সঙ্গে ছিলেন কমরেডস্ অপূর্ব মণ্ডল, প্রদীপ মণ্ডল, রুক্মিনী মণ্ডল, বিরজা মালী, পঞ্চায়েত সদস্যা অশোকা মালী, ভীষ্মদেব হালদার, শিফুল সরকার, ইকবাল সরদার ও হাসেম গাজী। গোটা কর্মসূচির নেতৃত্বে ছিলেন কমরেড নির্মল সরকার।

প্রবীণ পার্টিকর্মীর জীবনাবসান

এস ইউ সি আই-এর দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার জয়নগর-মজিলপুরের বিশিষ্ট সংগঠক কমরেড বিষ্ণুপদ পুরকাইত দীর্ঘ রোগভোগের পর গত ২৪ অক্টোবর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বৎসর। '৬০-এর দশকে তিনি দক্ষিণ বারাসতে নির্বাচনের কাজে অংশগ্রহণ করেন এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড সুবোধ ব্যানার্জীর সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর চরিত্রের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হন। পরবর্তীকালে দলের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে দলের সাথে যুক্ত হন। এরপর তিনি দক্ষিণ বারাসত ছেড়ে জয়নগর-মজিলপুরে চলে আসেন।

এই মানুষটি তাঁর উচ্চতর হৃদয়বৃত্তির জন্য দলমত নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা অর্জন করেন। কমরেড বিষ্ণুপদ পুরকাইত ব্যক্তিগতভাবে ছিলেন খুবই সৎ এবং নিজে যা বিশ্বাস করতেন তা যেমন ব্যক্তিগতভাবে পালন করতেন, সাধারণ মানুষকে বোঝাবার চেষ্টা করতেন — তেমনি পরিবারের লোকেদেরও দলের সঙ্গে যুক্ত করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন।

প্রথম সর্বভারতীয় পার্টি কংগ্রেসের আগে তিনি দলের সদস্যপদ অর্জন করেছিলেন। তিনি ছিলেন মজিলপুর লোকাল কমিটির অন্যতম সদস্য। তাঁর প্রয়াণে দল হারাল একজন সৎ নিষ্ঠাবান একনিষ্ঠ কর্মী ও সংগঠককে।

তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে গত ২৯ অক্টোবর সন্ধ্যা ৬টায় মজিলপুর জে এম ট্রেনিং স্কুল সমুখস্থ প্রাঙ্গনে এক স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় দলের কর্মী, সমর্থক ও গুণগ্রাহী মানুষের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য। সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় প্রবীণ কমরেড সুদেব দাস। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দলের রাজ্য কমিটি ও জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড গোপাল বসু। তিনি বলেন, দলমত নির্বিশেষে গরিব মেহনতি মানুষের অত্যন্ত কাছের মানুষ ছিলেন কমরেড বিষ্ণুপদ পুরকাইত। তিনি ছিলেন নির্ভীক, দৃঢ়চেতা। দলের লড়াই আন্দোলনকে সংগঠিত করতে গিয়ে চাকরি থেকেও সাসপেন্ডেড হয়েছিলেন। মৃত্যুর দিন পর্যন্ত মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় ব্যক্তিজীবন ও পারিবারিক জীবন পরিচালনা করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে জয়নগর-মজিলপুর পার্টি সংগঠনের ক্ষেত্রে যে শূন্যতা সৃষ্টি হল তা পূরণ করার জন্য উপস্থিত কমরেডদের কাছে তিনি আহ্বান রাখেন। স্মরণসভায় কমরেড গোপাল বসু ছাড়া এস ইউ সি আই দলের প্রাক্তন কাউন্সিলার কমরেড সুদর্শন হালদার সহ আরও অনেকে বক্তব্য রাখেন।

ক্যানিংয়ে এস ইউ সি আই-এর বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন

সকল গরিবের বি পি এল কার্ড, প্রত্যেক নাগরিকের রেশন কার্ড, প্রতিটি বাড়িতে বিদ্যুৎ, রাস্তার উন্নয়ন, সমস্ত দো-ফসলি জমিতে চাষের জল, নিকাশি ব্যবস্থা ও হাসপাতালের উন্নতির দাবিতে এবং প্রস্তাবিত বাড়তি খাজনা ও পঞ্চায়েতের মাধ্যমে কর চাপানোর প্রতিবাদে মাসাধিক কাল ধরে বুথভিত্তিক বৈঠক, হাট মিটিং, গ্রামে গ্রামে মিছিল, প্রচারের মাধ্যমে আন্দোলনের প্রস্তুতি গড়ে তোলা হয়। ২৭ অক্টোবর ক্যানিং-১ বিডিও এবং ফুড অ্যান্ড সাপ্লাই অফিসে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ক্যানিং হাসপাতাল মোড়ে জমায়েত হয়ে সহস্রাধিক মানুষের সুসজ্জিত দৃপ্ত মিছিল ক্যানিং শহর পরিক্রমা করে। বিডিও'র এক প্রতিনিধি ডেপুটেশন গ্রহণ করেন এবং দাবির যৌক্তিকতা স্বীকার করেন। ফুড ইন্সপেক্টর ডেপুটেশন নেন এবং এক মাসের মধ্যে সবাইকে রেশনকার্ড দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। বিডিও এবং ফুড সাপ্লাই অফিসে ডেপুটেশনে প্রতিনিধিত্ব করেন কমরেডস্ প্রতাপ নস্কর, ইয়াহিয়া আখন্দ, আলকাছ শেখ, অনিল মণ্ডল, ওয়াজেদ গাজী, মুজিবর মণ্ডল, সেকেন্দার জমাদার, রণজিৎ বায়েন, খোকন আখন্দ, রামপ্রসাদ মিস্ত্রী, ছাম্মাদ জমাদার, পালান হালদার, চুনিলাল মণ্ডল। স্মারকলিপি পাঠ করেন কমরেডস্ নারায়ণ নস্কর, ইয়াদালী জমাদার। বক্তব্য রাখেন হিরুলাল হালদার, রহিম মণ্ডল, সামসুদ্দিন লস্কর, প্রাণতোষ নস্কর, খোকন আখন্দ ও ইয়াহিয়া আখন্দ। ডেপুটেশনের পর বাসস্ট্যান্ডে সংক্ষিপ্ত পথসভায় বক্তব্য রাখেন কমরেডস আবেদ রহমান, বাদল সরকার।

ডেপুটেশনের প্রস্তুতি চলাকালীন জানা যায় যে, মাতলা নদীর উপর সেতু নির্মাণ হবে — যে দাবি নিয়ে এস ইউ সি আই দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চালিয়ে আসছে। তবে তার জন্য ক্যানিং বাসস্ট্যান্ড থেকে নদীঘাটের রাস্তার দু'দিকের বহু দোকানকে প্রশাসন উচ্ছেদ করবে। সিপিএম নেতাদের সাথে হাত মিলিয়ে প্রশাসন এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে নেওয়ার পর গণতান্ত্রিক ভেক ধরতে ২৬ অক্টোবর এস ডি ও'র দপ্তরে একটি সর্বদলীয় বৈঠক ডাকা হয়। মতামত বিনিময়ের নামে প্রশাসনিক কর্তা জানিয়ে দেন, উচ্ছেদ হবেই এবং সেটা পরের দিন থেকেই। ফলে সর্বদলীয় বৈঠক প্রহসনে দাঁড়ায় এবং সেকথা এস ডি ও'কে বলাও হয়। ব্রিজ ও দোকানদারদের পুনর্বাসন বিষয়ে এস ইউ সি আই-এর পক্ষ থেকে সেখানে লিখিত বক্তব্য পেশ করা হয়। তাতে সমস্ত উচ্ছেদ হওয়া ব্যবসায়ীর পুনর্বাসন এবং ক্ষতিপূরণের দাবি করা হয়। এবং বলা হয়, ব্রিজ নির্মাণের সময়সীমা আগামী তিন বছর পর্যন্ত যতটুকু ঘর না সরালে নয় ততটুকুই সরিয়ে সবাইকে ব্যবসা করার সুযোগ দেওয়া হোক।

চা-শ্রমিক বাবুরাম দেওয়ান জীবন দিয়ে দেখিয়ে গেলেন পুঁজিবাদী শোষণ কত ভয়ঙ্কর

[উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন চা-বাগানের মালিকরা শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি না দিয়ে, গ্র্যাচুইটি-পিএফ আত্মসাৎ করে, রেশন না দিয়ে, সর্বোপরি চা-বাগান বন্ধ করে দিয়ে শ্রমিকদের অনাহারে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে এবং সহস্রাধিক শ্রমিক অনাহারে মারাও গেছে। অনাহারী শ্রমিকদের এই মর্মান্তিক জীবনযন্ত্রণা বাবুরাম দেওয়ান নামের এক চা-শ্রমিকের হৃদয়ে ঝড় তুলেছিল। সমষ্টির স্বার্থে প্রতিবাদের উপায় হিসাবে তিনি বেছে নিয়েছিলেন আত্মহত্যার পথ। হৃদয়বৃত্তির যে উঁচু মান নিয়ে মালিকী শোষণ-জুলুমের নৃশংসতাকে বাবুরাম দেখেছিলেন এবং প্রতিবাদে আত্মবলিদানের শপথ নিয়েছিলেন, তা লড়াকু শ্রমিক সমাজ ও বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলনের কর্মীদের কাছে এক অমূল্য দৃষ্টান্ত। এই আত্মোপলব্ধি আত্মহত্যার আগে তিনি কয়েকটি চিঠিতে ব্যক্ত করে যান। লেখক শ্রী শুভেন্দু দাশগুপ্ত, সেই চিঠির কিছু অংশ ২৪ অক্টোবর সংবাদ প্রতিদিনে প্রকাশ করেছেন। তাঁর লেখা থেকে চিঠির অংশগুলি পুনরায় প্রকাশ করা হল।

এই মর্মস্পর্শী চিঠিটি একদিকে যেমন বর্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজে চূড়ান্ত মালিকী শোষণের নির্মম চিত্রটি উন্মোচিত করে, সাথে সাথে মালিকদের এহেন নির্মম শোষণের কথাটি আড়াল করে সিপিএমের মতো যেসব দল মালিকদের প্রতি শ্রমিকদের বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণের উপদেশ দেয়, তাদের দালাল চরিত্রকেও সমানভাবে উদ্‌ঘাটিত করে। — স.গ.]

বাবুরাম দেওয়ান, বয়স ৬৪, বাসিন্দা চংটং টি এস্টেট, ৮৬ ব্লক, চন্দ্রপাল ধুরা, ডাকঘর মারং, থানা পুলবাজার, জেলা দার্জিলিং, রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ।

বাবুবার দেওয়ান আত্মহত্যা করেন ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৬ সকালে।

ওই দিনই পুলবাজার থানায় বাবুরামের ছেলে বাবার আত্মহত্যা বিষয়ে অভিযোগ দায়ের করেন। লেখেন বাবুরাম দেওয়ানের আত্মহত্যার কারণ চংটং চা-বাগানের মালিক অজিত আগরওয়ালের চা-বাগান বন্ধ করে দেওয়া এবং ১২৫২ জন শ্রমিক ও কর্মচারীদের পরিবারকে অনাহারে রেখে দেওয়া।

আত্মহত্যা করার সময় বাবুরামের বুকে একটা কাগজ লাগানো ছিল। তাতে লেখা ছিল — এই আত্মহত্যা অজিত আগরওয়ালের বিরুদ্ধে। চংটং চা-বাগানের মালিক অজিত আগরওয়ালকে প্রশাসনের এখনই শাস্তি দেওয়া উচিত। কতটা নৃশংস হলে একজন ৬৫০০ জন মানুষকে অনাহারে রাখতে পারে? এটা প্রশাসনের কাছে প্রশ্ন।

আত্মহত্যা করার আগে বাবুরাম দেওয়ান কয়েকটা চিঠি লিখে রেখে যান। চিঠিগুলিতে এইসব লেখা আছে।

চংটং টি এস্টেট ১৩ জানুয়ারি ২০০৬ থেকে বন্ধ কোনও কারণ ছাড়াই।

আমার আত্মহত্যা অন্যান্য চা-বাগানের মালিকদের চিন্তায় ফেলবে। আমি মনে করি, আমার এই কাজ বৃহত্তর স্বার্থে। আমার আত্মহত্যা মালিকের বিরুদ্ধে। এই মালিকের জন্যই আমি আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছি।

এইজন্যই থানা এবং আদালতের অজিত আগরওয়ালকে কঠোর শাস্তি দেওয়া উচিত।

সবাইয়ের কাছ থেকে বিদায়।

যৌথস্বার্থে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

* * *

আমি যা করেছি, তা চংটংয়ের ৬৫০০ জন মানুষের ভাল'র জন্য করেছি। আমাদের পরিবার কোনওরকমে দু'বেলার খাবারটা জোগাড় করতে পারে। কিন্তু অন্যদের কষ্ট দেখে আমার খারাপ লাগে।

বাগান মালিক সরকারের ডাকা মিটিঙে বসে সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত হয়। মিটিং থেকে বেরিয়ে এসেই সেটা আর মনে থাকে না। বারবার এরকম হয়েছে। সরকার একে শাস্তি দেয়নি। আমার এই কাজ এর গ্রেফতার দাবি করে।

সমবেত স্বার্থের জন্য নিজের জীবন দিয়ে দেওয়া, আমার আগে কেউ এ কাজ করেনি। আমার মনে হয়, আমার এই কাজ দার্জিলিং পাহাড়ের ইতিহাসে থেকে যাবে।

* * *

চা-বাগান মালিক অজিত আগরওয়ালের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমাদের অস্ত্র ধরতে দেবে না পুলিশ। চংটংয়ের মানুষের হয়ে আমরা অনেক লড়াই করেছি। কিন্তু সরকার মালিকের মাথা নত করতে পারেনি এবং কোনও আইনি ব্যবস্থাও নিতে পারেনি।

একটা সাসপেনশন নোটিশ পাঠিয়ে দিয়ে চংটং চা-বাগান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ১৩ জানুয়ারি ২০০৬ থেকে, কোনও কারণ ছাড়াই। কয়েক বছর আগে এই অজিত আগরওয়ালই চংটংয়ের মানুষদের বাধ্য করেছিল বেঁচে থাকার জন্য তাদের যা যা আছে তা বিক্রি করে দিতে।

এখন অনেকেই তাঁদের ছাগল, মুরগি, বেচে দিয়েছেন। অন্যের বাগান থেকে ফল চুরি করে খাওয়া ছাড়া তাঁদের টিকে থাকার আর কোনও উপায় নেই।

শ্রমিকদের অসহায় অবস্থা আর কষ্ট দেখে আমরা পাঁচজনের একটা দল শপথ নিয়েছি, অজিত আগরওয়ালের কাজের প্রতিবাদে আত্মহত্যা করব। মালিকদের বিরুদ্ধে এই আত্মহত্যার লড়াই দিয়ে শুরু হবে দরিদ্র আর সর্বহারাদের কোনও কিছুতে পিছিয়ে না পড়ার ভবিষ্যৎ।

শুধু নিজের স্বার্থ দেখলে জন্তু হয়ে যেতে হবে।

দরিদ্র ও সর্বহারাদের জন্য একজনকে জীবন দিতে তৈরি হতে হবে।

কোনও শিশু অনাহারে কাঁদলে আমি সইতে পারি না। তাই মালিকের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু। যখন চংটংয়ের ৬৫০০ জন মানুষের জন্য পাঁচজন মানুষ আত্মহত্যা করবেন, কেউ বলবে না, এঁরা কাপুরুষ।

* * *

চংটং চা-শ্রমিকদের কোনও অধিকার নেই।

১। চংটং চা-বাগানের শ্রমিকরা তাঁদের প্রাপ্য মজুরি থেকে ৪ টাকা ৫৫ পয়সা কম মজুরি পেতেন।

২। জুলাই ১৯৮৫ থেকে সেপ্টেম্বর ২০০৫ শ্রমিকদের ১০ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার গ্র্যাচুইটি পাওনা রয়েছে।

৩। ১৯৯৮ সাল থেকে শ্রমিকদের জন্য একটাও পাকা বাড়ি বানানো হয়নি। কাঁচা বাড়ি সারানোও হয়নি।

৪। ২০০০ সাল থেকে শ্রমিকদের পাওনা সাপ্তাহিক রেশন দেওয়া হয়নি।

৫। শ্রমিকদের কাছ থেকে প্রভিডেন্ট ফান্ডের জন্য ৩৪ হাজার টাকা কেটে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু মালিক তা প্রভিডেন্ট ফান্ডে জমা দেয়নি।

৬। যখন ১৯৮৩ সালে প্রথম বাগানটা বন্ধ করে দেওয়া হয়, অজিত আগরওয়াল ১৮ সপ্তাহের মজুরি দেয়নি — যদিও শ্রমিকরা কাজ করেছিলেন। যখন ১৯৮৪ সালে বাগান খুলল, অজিত আগরওয়াল শুধু শ্রমিকদের ৪৫ টাকা, আর কর্মচারীদের ১০০ টাকা দিয়েছিল।

৭। ২০০৩ সালে আট সপ্তাহের বেশি বাগান বন্ধ থাকায় শ্রমিকদের খুব খারাপ সময় যায়। পরে মালিক শ্রমিকদের বাধ্য করে সপ্তাহে তিন দিন কাজ করে তিন দিন বেকার থাকতে।

৮। ১৯৯০ সাল থেকে কালীপুজোর এক সপ্তাহ আগে জ্বালানি কেনার জন্য শ্রমিকরা ৬৫ টাকা, কর্মচারীরা ৩১৫ টাকা এবং উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা ১৬০০ টাকা পেতেন। ২০০৫ থেকে এটা আর দেওয়া হয় না।

৯। অন্য বাগানের শ্রমিকরা ছাতা, চটি, টারপলিন পেলেও চংটং বাগানের শ্রমিকরা ১৯৯৮ থেকে এ সব পাননি।

১০। চংটং বাগানের শ্রমিকদের কোনও চিকিৎসা ব্যবস্থা নেই।

এই দানব মালিকের বিরুদ্ধে আত্মহত্যা ছাড়া আমার আর কী করার আছে? আর কোনও লড়াই করে এই দানবকে শিক্ষা দেওয়া যাবে না।

সবাইকে বিদায়।

সবার স্বার্থে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

— বাবুরাম দেওয়ান।

জয়নগর ২নং ব্লকে ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের লাগাতার আন্দোলনে দাবি আদায়

গত ১৯ সেপ্টেম্বর মধ্যরাতের ঝড়ে জেলার অন্যান্য অংশের মত জয়নগর ২নং ব্লকেও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতে শত শত বাড়ি ভেঙে যায়। হাজার হাজার বিঘা জমির নানা ধরনের চাষ নষ্ট হয়। শত শত পুকুরের মাছ নষ্ট হয়। হাজার হাজার গাছ উপড়ে যায়। সিপিএম সরকার মুখে যাই প্রতিশ্রুতি দিক না কেন, বাস্তবে তার কোন প্রতিফলন ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের সাহায্যের ক্ষেত্রে দেখা যায় নি। সরকারের উদাসীনতা ও অপদার্থতার প্রতিবাদে ২০ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর এস ইউ সি আই ব্লকে লাগাতার বিক্ষোভ আন্দোলন সংগঠিত করে। ২৭ সেপ্টেম্বর পাঁচ হাজারেরও বেশি মানুষ বিডিও অফিস ঘেরাও করে। বিডিও বলেন, ২০/২৫ দিনের মধ্যে সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের গৃহ অনুদান সহ অন্যান্য সাহায্য দেওয়া হবে, এবং ৩ জনের একটি কমিটি সমগ্র বিষয়টি দেখবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, বিডিও, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও প্রধানের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হয় তদন্ত কমিটি। ক্ষতিগ্রস্ত গরিব মানুষের যে তালিকা তারা তৈরি করে, বিডিও অফিসের এক অশুভ চক্র তা পাল্টে দিয়েছে। ফলে কোনও অনুদানই ক্ষতিগ্রস্তরা পায়নি। তারই প্রতিবাদে ১ নভেম্বর প্রায় দু'হাজার ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ আবার বিডিও অফিসে বিক্ষোভে সামিল হয়। বেলা ১টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত বিক্ষোভ চলে। বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যা কমরেড সুজাতা ব্যানার্জী, জেলা কমিটির সদস্য কমরেড বসুদেব পুরকাইত, সংগঠক কমরেড আনসার সেখ, কমরেড গোবিন্দ আহেরী প্রমুখ। বক্তারা বলেন — 'সরকারি ব্যর্থতা এবং অবহেলার বিরুদ্ধে লড়াই করে ত্রাণ এবং অনুদান আদায় হয়েছে। অনুদান বন্টন নিয়ে দুষ্টচক্র গরিবের টাকা মেরে দিতে চাইছে। আসুন লড়াই করে তা প্রতিরোধ করি।' ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড রূপম চৌধুরী এবং অন্যান্যদের মধ্যে কমরেডস বসুদেব পুরকাইত, সিরাজ মোল্লা, খালেক মোল্লা, মোবারক মোল্লা, কবিতা সরকার, মিলন সিন্‌হা, আশা ভাণ্ডারী প্রমুখ। স্মারকলিপিতে ৯ দফা দাবির মধ্যে বিডিও ৪টি দাবি মেনে দ্রুত কার্যকরী করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ৪টি অঞ্চলে অনুদান দেওয়া শুরু হয়। ডেপুটেশনে কমরেড রূপম চৌধুরী বলেন — লড়াই করেই এ পর্যন্ত যতটুকু দাবি আদায় হয়েছে তার কৃতিত্ব গরিব মানুষের। আজ গরিব মানুষের বিরুদ্ধে বড় লোকের দালালে পরিণত হয়েছে সিপিএম। চাষী ও গরিব মানুষকে জীবন ও জীবিকা থেকে উৎখাত করতে চাইছে। এর বিরুদ্ধে সঠিক লক্ষ্যে জনজাগরণ প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন, লাগাতার আন্দোলনের হাতিয়ার গণকমিটি গড়ে তুলুন। গরিবরা ঐক্যবদ্ধ হোন। ৩০ অক্টোবর কমরেড আব্দুল্লা দর্জি, কমরেড ফিরোজা হালদারের নেতৃত্বে ১০ জনের এক প্রতিনিধি দল জয়নগর ২নং ব্লকের এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট অফিসারকেও ডেপুটেশন দেন।

মুর্শিদাবাদে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প

মুর্শিদাবাদ জেলা বন্যা ও ভাঙন প্রতিরোধ কমিটির উদ্যোগে কলকাতার মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের সহায়তায় ২৭ ও ২৮ অক্টোবর কান্দী, বড়এগ্রা ও বেলডাঙ্গা থানায় ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। অ্যালোপ্যাথি ও হোমিও চিকিৎসার প্রায় ২০ জন ডাক্তার, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মী ক্যাম্প পরিচালনা করেন। বড়এগ্রা থানার হরিধ্বনি গ্রাম, কান্দী, পুরন্দরপুর অঞ্চলে খিদিরপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং বেলডাঙ্গায় মির্জাপুর বাঁধপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চিকিৎসা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। দু'দিনে ২৬৬৮ জন রোগীর চিকিৎসা হয়। বিনা পয়সায় মূল্যবান ওষুধ সরবরাহ করা হয়। বন্যা পরবর্তী সময়ে শীতের শুরুতে মূলত অপুষ্টি ও দারিদ্র্যের কারণে পেটের রোগ, নিউমোনিয়া, বার্ধক্যজনিত অসুখ, বিশেষ করে অল্পবয়সীদের চোখেও ছানি পড়ার মত বেশ কিছু সমস্যা দেখা যাচ্ছে বলে চিকিৎসকবৃন্দ জানান। কিছু জটিল রোগের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া হয়। চিকিৎসক দলে ডাঃ শুভজিৎ রায় ও জেলা এম এস সি সম্পাদক ডাঃ রবিউল আলম প্রমুখ অংশ নেন। দু'টি ক্যাম্প সংগঠনের উদ্যোক্তা মুর্শিদাবাদ জেলা বন্যা ও ভাঙন প্রতিরোধ কমিটির সহসম্পাদক গৌতম সাহা, সদস্য দিলীপ দাস, ছাত্রনেতা অভিজিৎ মণ্ডল। গণআন্দোলনের বিশিষ্ট সংগঠক অপূর্ব ব্যানার্জী নেতৃত্ব দেন। উল্লেখ্য, কলকাতা থেকে আগত টি সি এস মৈত্রী নামক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধি বিশ্বজিৎ মিত্র ক্যাম্প দু'টিতে অংশ নেন। ক্যাম্পগুলিতে ডাক্তার, স্বাস্থ্যকর্মী ও এলাকার স্বেচ্ছাসেবকদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও আন্তরিকতার স্পর্শে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। মুর্শিদাবাদ জেলা বন্যা ও ভাঙন প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি প্রবীণ সাংবাদিক প্রাণরঞ্জন চৌধুরী এম এস সি'র মেডিকেল টিমকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

একা মুনি টুডু নন, এরকম অনেক মাকেই পাওয়া যাবে আজ রাজ্যে

সুদীর্ঘ দশটি মাস অশেষ যত্নে গর্ভে লালন করে প্রবল যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে মায়েরা যে সন্তানের জন্ম দেন, কোনও মা কি পারেন সেই সদ্যোজাত সন্তানকে অন্যের হাতে তুলে দিতে? যদি পারেন তবে সে বড় মর্মান্তিক ঘটনাই। বীরভূম জেলার রামপুরহাট পুরসভার আদিবাসী পাড়ার মা মুনি টুডু সেটাই করেছেন। জন্মের পরদিনই সন্তানকে বিক্রি করে দিয়েছেন ঐ থানারই বাসিন্দা এক নিঃসন্তান দম্পতির কাছে। কীসের বিনিময়ে? কত টাকার বিনিময়ে? জানলে সকলেই হতবাক হবেন যে, মাত্র দশ কেজি চালের বিনিময়ে সন্তানকে দিয়ে দিয়েছেন মা মুনি। কতদিনের ক্ষুধা মিটবে ঐ দশ কেজি চালে ? তবে যে বলে মাতৃস্নেহ অপার! সন্তানের প্রতি কোন স্নেহই কি ওই মায়ের ছিল না ? না, মাতৃস্নেহের অভাব এক্ষেত্রে ঘটেনি। বরং অপত্য স্নেহই তাঁকে বাধ্য করেছে আপাত অমানবিক এই কাজ করতে। মাতা-পিতাহীন, স্বামী পরিত্যক্তা, হতদরিদ্র মুনি টুডু অন্যের আশ্রিতা। সন্তানকে সে কীভাবে লালনপালন করবে এই আশঙ্কাই তাঁকে বাধ্য করেছে স্বপ্ন, স্নেহ, মমতা — সমস্ত কিছু বুকে চেপে রেখে মূক যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে মাত্র দশ কেজি চালের বিনিময়ে সন্তানকে অপরের হাতে তুলে দিতে। মুনি টুডু জানিয়েছেন, পাথর খাদানে কাজ করতে গিয়ে তাঁর বিয়ে হয়েছিল ঝাড়খণ্ডের এক যুবকের সঙ্গে। এখন আর তার কোনও খোঁজ নেই। তাঁর আশ্রয়দাত্রী, সম্পর্কিত মাসী তালাকুড়ি মাড্ডি জানিয়েছেন, বিপিএল তালিকায় নাম থাকলেও তাঁরা চাল, গম, কিছুই পান না। পাথর খাদানে হাড়ভাঙা খাটুনি খেটেও সংসার চলে না। সন্তানকে তাঁরা খাওয়াবেন কী? রোগে-জ্বালায় রক্ষা করবেন কী করে? তাই বাধ্য হয়ে পেটের দায়ে, অনটনের হাত থেকে মুক্তি পেতে, অন্য কোথাও সন্তান যাতে খেয়ে পরে বাঁচতে পারে এই আশায় তাঁরা তাকে বিক্রি করেছেন।

শুধু একা মুনি টুডু নন, এরকম অসংখ্য মায়ের কথা এখন সংবাদপত্রের পাতা খুললে প্রায়ই নজরে পড়ে। ক'দিন আগেই প্রকাশিত হয়েছে তিন সন্তানের এক জননীর কথা — যিনি দুই সন্তানের ভরণপোষণ এবং চিকিৎসার খরচ যোগাতে এক সন্তানকে বিক্রি করতে চেয়েছেন। অনাহারে বা অপুষ্টিতে মৃত্যুর মতো বেদনাদায়ক দুঃসংবাদও এখন প্রতিদিনকার খবর। অথচ রাজ্যের নেতা-মন্ত্রীদের কথায় এর চিহ্নমাত্র পাওয়া যায় না। টিভি খুললেই মন্ত্রীদের দেখা যায়, লম্বা-চওড়া বক্তৃতায় উন্নয়নের রঙিন চিত্র তুলে ধরতে। তাঁরা বলেন, রাজ্যে তাঁরা এমন গ্রামোন্নয়ন ঘটিয়েছেন যে গ্রামে আর গরিব, না খেতে পাওয়া মানুষ কেউ নেই; আগের মতো নাকি গ্রামের মানুষের ঢেউ আর শহরে আছড়ে পড়ে না। এই প্রচারের সপক্ষে জনমত তৈরি করতে জোরদার চেষ্টা চলছে। ঢাক-ঢোল পিটিয়ে একেবারে বিজ্ঞাপন দিয়ে চলছে এই উন্নয়নের প্রচার। কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে বিজ্ঞাপনে তাঁরা বিশ্বের সামনে তুলে ধরছেন 'বাংলার মুখ'। কিন্তু কী দিয়ে তাঁরা ঢাকবেন সন্তানহারা মা মুনি টুডুর মুখ। সে মুখ বিজ্ঞাপনের সমস্ত মিথ্যা প্রচারকে ঠেলে সরিয়ে সোচ্চারে ঘোষণা করছে — উন্নয়নের যে মুখ তোমরা বিজ্ঞাপনে তুলে ধরছ — তা বাংলার প্রকৃত মুখ নয়, মুখোশ। তার তলায় চাপা পড়ে রয়েছে নিঃসীম দারিদ্র, অপুষ্টি, অনাহার আর বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু। রাজ্যের কয়েক হাজার গ্রাম আজও প্রবল দারিদ্র কবলিত, বহু মানুষের অবস্থান আজও দারিদ্রসীমার নীচে। সরকারি হিসাবেই রাজ্যে ৪৬০৪টি গ্রামে বছরে দু-তিন মাস অনাহারের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ বছরের অবশিষ্ট নয়-দশ মাস এই গ্রামগুলির কাটে অর্ধাহারে। বাস্তবে এই সংখ্যা আরও অনেক বেশি। রাজ্যের বিস্তীর্ণ অঞ্চল এখনও অন্ধকারে ঢাকা — বিদ্যুৎ পৌঁছায়নি। পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই। শিক্ষা-চিকিৎসা দুর্মূল্য — সাধারণ মানুষের আয়ত্তের বাইরে।

তাহলে সরকারি নেতা-মন্ত্রীদের এই বহু ঘোষিত উন্নয়ন আসলে কাদের উন্নয়ন! উন্নয়ন মানে যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের উন্নয়ন বুঝিয়ে থাকে, তাদের খাওয়া-থাকা-পরা শিক্ষা-চিকিৎসার গ্যারান্টি বুঝিয়ে থাকে, তবে তার সুফল কেন পৌঁছয় না মুনি টুডুদের কাছে। কেন তারা পাথরখাদানে, খনিতে, কারখানায়, জমিতে হাড়ভাঙা খাটুনি খেটেও সন্তানের মুখে দু-মুঠো খাবার তুলে দিতে পারে না। কেন সন্তান বিক্রির মূল্যে ক্ষুণ্নিবৃত্তি করতে হয় তাদের। কিছু ফ্লাইওভার, হাইওয়ে, আর শপিংমলের ঔজ্জ্বল্যে ঢাকা পড়বে কি এই অন্ধকার? আসলে বুদ্ধদেববাবু, নিরুপমবাবু, আর মনমোহন সিংদের কাছে উন্নয়নের মানে দেশের আপামর সাধারণ মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন নয়, সমাজের মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগী অংশের মানুষের উন্নয়নকেই গোটা সমাজের উন্নয়ন বলে তাঁরা দেখাতে চান। কিন্তু উন্নয়নের এই সংজ্ঞা মানবে কেন দেশের শোষিত সাধারণ মানুষ?

কিন্তু কেন এমন হয়? কেন স্বাধীনতার ছ'দশক পরেও হাজার হাজার মুনি টুডু এমন করে দারিদ্র্যের অতল গহ্বরে তলিয়ে যান; অথচ সমাজেরই আর এক ক্ষুদ্র অংশ তাদেরই ঘামরক্ত পরিশ্রমের বিনিময়ে অর্জিত সমস্ত সুফল ভোগ করতে থাকে? তবে কি সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যেই এর কারণ লুকিয়ে আছে? মাতৃত্বের এই অবমাননা সত্যিই যদি আমাদের পীড়া দেয়; স্নেহ, মায়া, মমতা প্রভৃতি গুণগুলিকে যদি সমাজে রক্ষা করতে হয় তবে এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করতে হবে এবং তার সমাধানে যা করণীয় তা করতে উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে অর্থাৎ, এই শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে যত দ্রুত সম্ভব উচ্ছেদ করে শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করতে হবে।

২ নভেম্বর হলদিয়া মহকুমা বাস্তু ও কৃষিজমি রক্ষা যুক্ত কমিটি আহূত গণঅবস্থান ও বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন সারা বাংলা কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড মানব বেরা

প্রবীণ পার্টিকর্মীর জীবনাবসান

কলকাতা জেলার সরশুনা অঞ্চলের প্রবীণ কর্মী কমরেড শৈলেন চৌধুরী গত ২৮ অক্টোবর রক্তক্ষরণজনিত কারণে ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর।

১৯৭৫-'৭৬-এর জরুরি অবস্থার ভয়াবহ দিনগুলিতে খিদিরপুরে বসবাসকালে একে একে তাঁর তিন ছেলে, মেয়ে এবং স্ত্রী এস ইউ সি আই দলের সাথে যুক্ত হন। সেসময় তিনি তাঁদের প্রচণ্ড বিরোধিতা করতেন। তখন তিনি ছিলেন সক্রিয় কংগ্রেস কর্মী। কিন্তু ১৯৭৬ সালের ৬ আগস্ট ভারতবর্ষের বিপ্লবের প্রাণপুরুষ কমরেড শিবদাস ঘোষের মরদেহ নিয়ে শোকমিছিল দেখে তিনি প্রবলভাবে আলোড়িত হন এবং সেই প্রৌঢ় বয়সে দলের সঙ্গে যুক্ত হন। এরপর থেকে তিনি যেখানেই বাস করেছেন বা কর্মোপলক্ষে যেখানেই গেছেন, সেখানেই কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাকে নিয়ে গেছেন। যেখানেই থেকেছেন সেখানেই একটি সার্কেল গড়ে তুলেছেন। শিশু-যুবা-বৃদ্ধ সব বয়সের মানুষের সঙ্গেই তাঁর প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, পাড়ার মা-বোনেদের কাছেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র। দল এবং দলের বাইরে ছোট-বড় সকলেরই তিনি ছিলেন 'মেসোমশাই'।

তিনি ছিলেন দলের আবেদনকারী সদস্য। বৃদ্ধ বয়সে অসুস্থ শরীরেও তিনি দলের সমস্ত কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতেন, স্থানীয় মানুষদের নিয়ে আঞ্চলিক সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতেন, একা একা বাড়ি বাড়ি ঘুরে গণদাবী পত্রিকা বিক্রিতে তাঁর ক্লান্তি ছিল না। পার্টির চাঁদা দেওয়ার বিষয়ে তিনি ছিলেন নিয়মনিষ্ঠ। দলের আদর্শ চর্চার মধ্য দিয়ে তিনি সংস্কারমুক্ত হয়ে উঠেছিলেন। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিষয়ে তিনি নেতৃত্বের সঙ্গে পরামর্শ করতেন।

তিনি তাঁর সন্তানদের আরও ভালো করে দল ও বিপ্লবের কাজে আত্মনিয়োগ করার জন্য অনুপ্রাণিত করতেন। কারণ বহুদর্শী এই মানুষটি তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝেছিলেন, মর্যাদা নিয়ে বাঁচা এবং মরার জায়গা একটিই — আর, তা হল এস ইউ সি আই দল।

তাঁর মরদেহ বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হলে প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে। তাঁর মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান দলের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড সুজিত ভট্টশালী, কলকাতা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সান্টু গুপ্ত, আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক কমরেড চণ্ডী দত্ত, ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড শান্তি ঘোষ, এম এস এস-এর কলকাতা জেলা সম্পাদিকা কমরেড প্রণতি কর, দলের খিদিরপুর আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক কমরেড জাহেদ আখতার, দলের আর্ট ইউনিটের পক্ষে কমরেড মিহির রায় সহ অন্যান্য গণসংগঠন ও স্থানীয় মানুষ।

কমরেড শৈলেন চৌধুরী লাল সেলাম।

শিল্পের নামে জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে হলদিয়ার মানুষ ক্ষোভে ফুঁসছে

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রাম, হলদিয়া, সুতাহাটা, মহিষাদল থানার ১৭২টি মৌজার ২৫ হাজার একরের বেশি এক, দুই, তিন ফসলি কৃষিজমি অধিগ্রহণ করে 'স্পেশাল ইকনোমিক জোন' কুঁকড়াহাটিতে টাউনশিপ এবং নন্দীগ্রামে 'মেগা কেমিকেল হাব' করার নামে দখল নেওয়ার রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে হলদিয়া মঞ্জুশ্রী মোড়ে পাঁচ শতাধিক কৃষক ছাত্র যুব মহিলা ২ নভেম্বর বেলা ১০টা থেকে সন্ধ্যে ৫টা পর্যন্ত গণঅবস্থান ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। এই অবস্থান-বিক্ষোভ আন্দোলনের উদ্যোক্তা হলদিয়া মহকুমা বাস্তু ও কৃষিজমি রক্ষা যুক্ত কমিটি। কনভেনশনে বক্তারা বলেন, হলদিয়া শিল্পাঞ্চল গড়ে ওঠার সময় ২২০০ টাকা, ২৩০০ টাকা একর দামে কৃষিজমি অধিগ্রহণ করে কৃষকদের উচ্ছেদ করা হয়েছিল, পরিবার পিছু একজনকে চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আজ পর্যন্ত উচ্ছেদ হওয়া পরিবারগুলির ২৫ শতাংশকেও চাকরি দেওয়া হয়নি। ঐসব জমি এখন হলদিয়া উন্নয়ন পর্ষদ এক লক্ষ, দেড় লক্ষ টাকা কাঠা দামে লিজ দিচ্ছে বা বিক্রি করছে। ফলে বিশ্বায়নের নামে আবার জমি দখলের এই শয়তানি চক্রান্ত কৃষকরা বুঝেছে, তাঁরা কোন যুক্তিতে জমি ছাড়তে রাজি নন। কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন সুতাহাটার প্রাক্তন এম এল এ শিবনাথ দাস, শ্রীকেশ প্রামাণিক, প্রফুল্ল কুমার মাইতি, শুভেন্দু শেখর দাস, নন্দ পাত্র সহ বিভিন্ন এলাকার গ্রাম কমিটির সম্পাদক সভাপতিরা।

এই কনভেনশনে আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন সারা বাংলা কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্য মানব বেরা। তিনি সিঙ্গুরের কৃষকদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম থেকে শিক্ষা নিয়ে গ্রামে গ্রামে ছাত্র, যুব, মহিলা, কৃষক কমিটি গড়ে তুলতে আহ্বান জানান।

এই কনভেনশনে যোগ দিতে হলদি নদীর ওপারে নন্দীগ্রামের সোনাচূড়া, সাউদখালী কেন্দ্যামারী, মনুচক, জালপাই, দীনবন্ধুপুর, মহম্মদপুর সহ বিভিন্ন গ্রাম থেকে নৌকা ভাড়া করে শত শত মানুষ আসেন। কনভেনশনে এসেছেন সুতাহাটা থানার কাশীপুর গ্রামের ৮৫ বছরের বৃদ্ধ নরেশ চন্দ্র মান্না। তিনি বলেন, আড়াই বিঘা মাত্র জমি, ২২ জনের পরিবার। খাটাখাটি করে সংসার চলে। ঐ জমিটুকু গেলে খাব কী, থাকব কোথায়? মরে গেলেও জমি ছাড়ব না। মহিষাদল থানার বাসুনিয়া গ্রামের খেতমজুর ৫৭ বছর বয়সী কালিপদ বর্মন বলেন — আমার ২৫ কাঠা জমি, ১০ জন পরিবারের সদস্য। ছেলেদের নিয়ে এলাকায় শ্রম করে কোনরকম সংসার চলে। জমি বাড়ি থেকে উচ্ছেদ হয়ে যাব কোথায়? কাজ পাব কোথায়? বাঁচব কী করে? মরে গেলেও জমি বাস্তু ছাড়ব না। আমার গ্রামের ৯০ ভাগ মানুষই জমি ছাড়বে না। নন্দীগ্রাম থানার কেন্দ্যামারী, কালিচরণপুর, সাউদখালি গ্রামের সেখ সাহাউদ্দীন, মণ্টুকুমার রঞ্জিত সবারই এক কথা — আমাদের জমিতে ধান, খেসারী, কলাই, সরষে, আলু, সূর্যমুখী সহ নানা সবজির চাষ হয়। এই জমিকে সরকার বলছে অ-চাষ জমি, একফসলি জমি। কোন প্রতিশ্রুতিতে আমরা জমি ছাড়ব না, লড়াইয়ের জন্য আমরা এককাট্টা। এই কনভেনশন থেকে ভবানীপ্রসাদ দাসের নেতৃত্বে জয়দেব গায়েন, নিশিকান্ত মণ্ডল, উত্তমকুমার সামন্ত, অসিত খাঁড়া সহ ১২ জনের এক প্রতিনিধি দল হলদিয়া এস ডি ও এবং এ ডি এম-এর কাছে ডেপুটেশন দেন।

শিক্ষার মানোন্নয়নে পাশ-ফেল প্রথা অবিলম্বে চালু করতে হবে

প্রাথমিক স্তরে পাশ-ফেল প্রথাবর্জিত শিক্ষাব্যবস্থা দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে চলার পর ২০০৫ সালে সরকার আয়োজিত ৪র্থ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের ডিএটি পরীক্ষার (Diagnostic Achievement Test) ফলাফল বিশ্লেষণ করে যে সরকারি রিপোর্ট সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে তাতে দেখা গেছে, ফলাফল সন্তোষজনক তো নয়ই, বরং খুবই খারাপ। মাত্র ৪টি জেলার (দুই মেদিনীপুর ও দুই ২৪ পরগণা) ফলাফল গড় মানের, বাকিদের অবস্থা খুবই সঙ্গিন। কেন এই মারাত্মক অবস্থা তার পরিপ্রেক্ষিতে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষামন্ত্রী পার্থ দে বলেছেন, পাশ-ফেল প্রথার বিষয়টি নিয়ে ভাবতে হবে।

কিন্তু এই ঘটনাটি শিক্ষামন্ত্রী তথা তাঁর সরকারের মনে সত্যিই কোন উদ্বেগ জাগিয়েছে কি, নাকি এ শুধু কথার কথা? প্রশ্নটা উঠছে এই কারণে যে, এটা শুধু আজকের হঠাৎ করে আসা কোন অঘটন নয়, ১৯৯৫ সালে আই এস আই এবং এন সি ই আর টি-র সমীক্ষায় দেখা গিয়েছিল, ৪র্থ শ্রেণীর শতকরা ২০ জন ছাত্রছাত্রীও ঠিকমত বাংলা পড়তে বা লিখতে পারে না, অঙ্কের ন্যূনতম জ্ঞানটুকুও তাদের নেই। ঐ রিপোর্ট দেখেও সরকারের কোন টনক নড়েনি। বর্তমান ঘটনাও যে তাদের বিচলিত করেছে তারও যথার্থ কোন চিহ্ন এখনও পরিলক্ষিত হয়নি। শুধু চাপে পড়ে কিছু কথা বলা ছাড়া তাদের অবস্থান ত্রিশ বছর আগেকার জায়গাতেই রয়েছে।

এই ঘটনার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে যদি আমরা অতীতের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাব, ১৯৭৭ সালে এই সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পাশ-ফেল প্রথা এবং চতুর্থ শ্রেণীর শেষে প্রাথমিক শেষ পরীক্ষা বা বৃত্তি পরীক্ষার অবলুপ্তি ঘটে। সেদিন কোন প্রতিবাদ বা আবেদনে তারা সাড়া না দিয়ে জবরদস্তি তাদের নীতি সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার আওতাধীন বিদ্যালয়গুলিতে চাপিয়ে দেয়। ফলত এ রাজ্যে বিদ্যালয়ে পড়তে আসা লক্ষ লক্ষ শিশুর সামনে ইংরেজি শিক্ষার দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়। পাশ-ফেল প্রথা না থাকার কারণে পরীক্ষাব্যবস্থা কার্যত উঠে গিয়ে শিক্ষা প্রহসনে পর্যবসিত হয়। অথচ এ রাজ্যেই বেসরকারি তত্ত্বাবধানে চলা বিদ্যালয়গুলিতে ইংরেজি শিক্ষা এবং পাশ-ফেল প্রথা সহ পরীক্ষাব্যবস্থা চালু থাকে। বাস্তবে এক দ্বৈত শিক্ষাব্যবস্থা চালু হয়, যা আজও বর্তমান।

তখন সরকারের যুক্তি ছিল, ইংরেজি সাম্রাজ্যবাদের ভাষা, তাছাড়া ইংরেজি ভীতির ফলে ছেলেমেয়েরা স্কুলে আসতে চায় না, ইত্যাদি ইত্যাদি। সুতরাং ইংরেজি পরিত্যাজ্য। দীর্ঘ ১৯ বছর ধরে এস ইউ সি আইয়ের নেতৃত্বে রাজ্যের সাধারণ মানুষ সরকারি এই নীতির বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলন করেছে। এই আন্দোলনে রাজ্যের শ্রমিক, কৃষক সহ সর্বস্তরের সাধারণ মানুষের সাথে সামিল হয়েছিলেন রাজ্য তথা দেশের লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক, কবি, বিচারপতি, বিজ্ঞানী সহ বিভিন্ন অংশের মানুষ। পরিশেষে এই ইস্যুতে সফল বাংলা বন্‌ধও পালিত হয়। রাজ্য সরকার তখন বাধ্য হয়ে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে। অবশেষে ১৯৯৯ সাল থেকে এ রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থায় আবার ইংরেজি ফিরে এসেছে এবং বর্তমানে প্রথম শ্রেণী থেকে ইংরেজি পাঠদান চলছে, এ'কথা সকলের জানা। গণআন্দোলনের ইতিহাসে এই ঐতিহাসিক বিজয় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। যদিও উন্নতমানের ইংরেজি পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ এবং সুষ্ঠুভাবে ইংরেজি পাঠদানের দাবিতে এখনও আন্দোলন চলছে।

সরকার ইংরেজির দাবি মানতে বাধ্য থাকলেও পাশ-ফেল প্রথা চালু করার দাবির প্রতি এখনও কোন নমনীয় মনোভাব দেখায়নি। বৃত্তিপরীক্ষা চালুর পরিবর্তে নিজেদের খুশিমত ডিএটি পরীক্ষা চালু করেছে। পাশ-ফেল প্রথা সম্পর্কেও তাদের সেই একই যুক্তি ছিল, অর্থাৎ ফেল-এর ভয়ে ছেলেমেয়েরা স্কুলে আসতে চায় না, মাঝপথে লেখাপড়া ছেড়ে দেয়। তাই এই ব্যবস্থা বাতিল করে সকলের জন্য 'অবাধ প্রমোশন' (নো-ডিটেনশন) নীতি চালু হয়েছে। অর্থাৎ এর ফলে ফেল-এর কোন ভয় থাকবে না। সকলে স্কুলে আসতে আগ্রহী হবে এবং মাঝপথে লেখাপড়া ছেড়ে চলেও যাবে না, অর্থাৎ ড্রপ আউট কমবে। কিন্তু বাস্তবে কী দেখা গেল? ড্রপআউট কমার পরিবর্তে ভীষণভাবে বাড়ছে, ব্যাপক সংখ্যায় স্কুলছুট দেখে সকলেই আতঙ্কিত।

সরকারি ভাষ্য অনুযায়ী প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হয় ২৭/২৮ লক্ষ ছেলেমেয়ে। দ্বিতীয় শ্রেণীতে সরকার আবার একটি পরীক্ষা নিচ্ছে যার নাম বহির্মূল্যায়ন (External Evaluation)। দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য সরকারি পরীক্ষায় কত ছেলেমেয়ে বসছে? ১৩/১৪ লক্ষের মত। এক বছরেই প্রায় অর্ধেক অর্থাৎ প্রায় ৫০ শতাংশ ড্রপ-আউট। ৪র্থ শ্রেণীর শেষে শতকরা প্রায় ৭০ শতাংশ ছেলেমেয়ে ড্রপ-আউট হয়ে যাচ্ছে। আর মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসে ছয়-সাড়ে ছয় লক্ষের মতো। যদি ২৭/২৮ লক্ষ ছাত্রছাত্রী প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হয় তাহলে মাধ্যমিকের সংখ্যাটা ছয়-সাড়ে ছয় লাখ কেন? বাকিরা কোথায় যাচ্ছে? ড্রপ-আউট নয় কি?

যদি ইংরেজি ও পাশ-ফেল প্রথা ভীতির কারণ হয় তাহলে বেসরকারি স্কুলগুলি তো উঠে যাওয়ার কথা। কারণ সেখানে তো এই দুটো জিনিষ শুধু আছে তা নয়, গুরুত্ব দিয়েই দেখা হয়। সেই কারণে ব্যাপকহারে বেসরকারি স্কুল বেড়েছে। পরিসংখ্যান বলছে, সরকারি ব্যবস্থাপনার প্রায় সমান্তরাল হারে বেসরকারি স্কুল চলছে। অন্যদিকে ছাত্র অভাবে, কোন কোন ক্ষেত্রে শিক্ষক অভাবে অনেক সরকারি স্কুল উঠেই যাচ্ছে। সারা রাজ্যে এই সংখ্যাটা দু'হাজারের মতো। সংখ্যাটা নেহাত কম নয়।

পাশ-ফেল প্রথা তুলে দেওয়ার সময় সরকারি ঘোষণা ছিল — তারা নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন প্রথা চালু করবে। দেশ-বিদেশের উদাহরণ দিয়ে তারা দেখিয়েছে — পৃথিবীর কোথাও পাশ-ফেল প্রথা নেই, নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন প্রথাই হচ্ছে বৈজ্ঞানিক তথা সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। তাই তারা এই প্রথা চালু করছে।

বিদেশের উদাহরণ দেওয়ার সময় তারা একটা সত্য গোপন করেছিল — তা হ'ল উপযুক্ত পরিকাঠামো এখানকার শিক্ষাব্যবস্থায় আছে কি না? বিদেশে ন্যূনতম ৪টি শ্রেণীর জন্য নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন প্রথা চালু হয়েছে কি মাত্র একজন শিক্ষক দিয়ে? ভাঙা চালাঘরে বা গাছতলায় স্কুল চলছে? বইপত্র ঠিকমত পাওয়া যাচ্ছে না? শিক্ষোপকরণ বলতে মাত্র একটি ব্ল্যাকবোর্ড (তাও সর্বত্র নেই) — এমন নজির তারা দেখাতে পারবে কি? নাকি চিত্র ঠিক এর উল্টো। সেখানে শুধু শ্রেণীভিত্তিক শিক্ষক নয়, ১৫/২০ জন ছাত্রপিছু একজন শিক্ষক। আর আমাদের রাজ্যে আইনি হিসাবে ৪০ জন ছাত্রপিছু ১ জন শিক্ষক থাকার কথা, কিন্তু বাস্তবে ১৫০/২০০/২৫০ ছাত্রপিছু ১ জন শিক্ষক। এছাড়া বিদেশের স্কুলগুলিতে শিক্ষোপকরণ বলতে এমন সমস্ত আধুনিক জিনিসপত্র ব্যবহার করা হয়, যা আমাদের কল্পনার অতীত। শিক্ষকের যোগ্যতাও সেখানে অন্য ধরণের। শুধু একটা ট্রেনিং নয়, বরং মনস্তত্ত্ব জানার বিষয় সহ আরও অনেক বিষয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কিন্তু এসব কিছু ছেড়ে দিয়ে বিদেশের নকল করে শুধু নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন চালু করে দিলাম বললেই শিক্ষার মান বেড়ে যাবে? ড্রপ-আউট কমে যাবে? স্কুলে আসার আগ্রহ বাড়বে? নাকি এসব লোক ঠকানোর কৌশল? কী করা হয়েছে আমাদের মূল্যায়ন ব্যবস্থায়? নম্বরের পরিবর্তে গ্রেড প্রথা — অর্থাৎ ক, খ, গ, ঘ, ঙ চালু করা হয়েছে। ৮০-১০০ পেলে 'ক', ০-২০ পর্যন্ত 'ঙ'। ৮০ এবং ১০০, কিংবা ০ এবং ২০-র মধ্যে কোন ফারাক নেই? গ্রেড দিলেই সব বোঝা যাবে? তারপরে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় স্থানাধিকারী নির্ণয়ের কোন ব্যবস্থা নেই। 'ক' পেলে সবাই ভাল। আবার যে '০' পেল, যে '২০' পেল দু'জনেই 'ঙ'। এর দ্বারা মান বোঝা যাবে? এগুলি যথার্থ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, নাকি ফাঁকিবাজি ব্যবস্থা!

ফতোয়া জারি করা হল, নম্বর দেওয়া চলবে না। প্রথম, দ্বিতীয় এসব ঘোষণাও চলবে না। তাহলে পরবর্তী শ্রেণীতে নাম সাজানো হবে কীভাবে? অর্থাৎ ক্রমিক সংখ্যা কীভাবে থাকবে? সেখানে বলা হল — আলফাবেটিক্যালি অর্থাৎ নামের বর্ণমালা অনুসারে। 'অ' দিয়ে নাম শুরু হলে সে '০' বা 'ঙ' পেলেও তার নাম প্রথমে চলে আসতে পারে, আবার স, হ, ক্ষ দিয়ে নাম হলে সে ১০০ নম্বর বা 'ক' পেলেও তার নাম পিছনে থাকবে। কী অপূর্ব বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা ! এ নাকি শিশুমনে ভাল প্রভাব বিস্তার করবে!

এই সরকার যখন থেকে পাশ-ফেল প্রথা ও ইংরেজি বিসর্জন দিয়ে নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন প্রথা চালু করল, তখন থেকেই তার পাশাপাশি শারীরশিক্ষার নাম করে স্পোর্টস বা খেলাধূলার ব্যবস্থাও চালু করল। সেখানে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হ'ল। অঞ্চল, সার্কেল, জেলা, রাজ্য বিভিন্ন পর্যায়ে। এবং দেখা গেল, এসব প্রতিযোগিতায় যারা ভাল ফল করছে তারা বুক ফুলিয়ে প্রাইজ নিচ্ছে, সরকারই এই প্রাইজ দিচ্ছে। খুব ভাল কথা। এখানে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদির জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা। তাহলে যারা পেল না, তাদের মনে কোন বিকার ঘটবে না? অথচ যারা লেখাপড়ায় ভাল, কিংবা ভাল ফল করছে তাদের জন্য কোন প্রাইজ নেই, এমনকী প্রথম, দ্বিতীয় ইত্যাদির ঘোষণাও চলবে না। এখানে পুরস্কার পেলে নাকি শিশুমনে বিকার ঘটবে? সরকারের ফতোয়া অনুযায়ী এই ব্যবস্থা আজও চলছে।

আবার মজা হল, বেশ কয়েক বছর এভাবে যাওয়ার পর এবং শিক্ষক-অভিভাবক মহল থেকে প্রতিবাদ ওঠার পর তারা এক অদ্ভুত লাইন নিলেন। সেটি হল, গ্রেডও লেখ, নম্বরও লেখ, অর্থাৎ ক, খ লেখাও হবে, পাশাপাশি নম্বরও দেওয়া হবে। বেশ কয়েক বছর এই ধরনের ব্যবস্থা চালুর পর হঠাৎ শোনা গেল — ক, খ, গ, ঘ, ঙ পর্যন্ত দিয়ে চলছে না। তাই আমদানি করা হল 'চ'। কোন কমিটি বা কমিশনের সুপারিশ ছাড়াই হঠাৎ হঠাৎ এসব জিনিস হচ্ছে। সর্বশেষ, এখন বলা হচ্ছে, যদি কোন ছাত্রছাত্রী আশানুরূপ ফল না করতে পারে তাহলে তাদের আটকে রাখাও যেতে পারে এবং ডিআইএসই নামক ফরমে 'রিপিটর' হিসাবে দেখানোর কথাও বলা হচ্ছে। অর্থাৎ, ঘুরিয়ে পাশ-ফেল প্রথার গুরুত্বই স্বীকার করা হল। তারা একটু একটু করে মচকাচ্ছে, কিন্তু পুরোপুরি ভাঙতে বড্ড লজ্জা হচ্ছে।

এখন তারা একদল লোক তৈরি করছে — যাদের নাম দেওয়া হচ্ছে আরটি বা আরপি ইত্যাদি। এঁদের মধ্যে অনেকে আছেন শিক্ষক, অনেকে অবসরপ্রাপ্ত বা এই জাতীয়। বিভিন্ন সভা-সমিতিতে শিক্ষকদের সামনে বোঝানোর জন্য এঁদের তুলে ধরা হচ্ছে। খোঁজ নিলে দেখা যাবে, এঁরা অনেকেই নিয়মিত স্কুলে যাননি, গেলেও ঠিকমত ক্লাস করেননি, অনেকের স্কুলে ছাত্রছাত্রী বলতে প্রায় কিছুই ছিল না, আবার অনেকে নিয়োগের দিন থেকে শুধুমাত্র এমন সব কাজ করে গেছেন যার সাথে পাঠদানের কোন সম্পর্ক ছিল না। এঁদের দিয়ে এসব করানোর উদ্দেশ্য কি শিক্ষার অগ্রগতির প্রয়োজনে? তা কিন্তু নয়। শিক্ষার গতি স্তব্ধ করে সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থ চরিতার্থ করার হীন উদ্দেশ্য এর মধ্যে নিহিত।

চতুর্থ শ্রেণীর প্রাথমিক শেষ পরীক্ষা বা বৃত্তি পরীক্ষা সরকার চালু করছে না কেন? যদি এর পেছনে সাধারণ শিক্ষক-অভিভাবকদের সমর্থন না থাকত তাহলে অন্য কথা। কিন্তু আমরা দেখছি, সরকার এই ব্যবস্থাটি তুলে দেওয়ার পরে এ রাজ্যের শিক্ষাবিদ-বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষকসমাজের তত্ত্বাবধানে ১৯৯২ সাল থেকে বেসরকারিভাবে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদের পরিচালনায় ৪র্থ শ্রেণীর শেষে বৃত্তি পরীক্ষা চলছে এবং এই পরীক্ষা ক্রমাগত জনপ্রিয় হচ্ছে। '৯২ সালে অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় ২০ হাজার ছাত্রছাত্রী বর্তমানে সাড়ে তিন লক্ষে পৌঁছেছে। এই পরীক্ষার প্রতি বিপুল জনসমর্থন দেখে সরকারের সম্বিত ফেরা উচিত ছিল। কিন্তু তারা তা না করে দলীয় শিক্ষক সংগঠনের সুপারিশ অনুসারে '৯৯ সালে চালু করল দ্বিতীয় শ্রেণীর বহির্মূল্যায়ন। শুরু থেকেই সকলের কাছে ধিক্কৃত এই পরীক্ষাটি আজও চলছে। কিন্তু এর দ্বারা হালে পানি না পেয়ে অবশেষে হঠাৎ করে ২০০৫ সালে সরকার চালু করল চতুর্থ শ্রেণীর ডিএটি পরীক্ষা। ২০০৫-এর পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়নি। সম্প্রতি একটি রিপোর্ট সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ প্রকাশ করেছে — যা সমস্ত মহলকে যুগপৎ বিস্মিত ও আতঙ্কিত করে তুলেছে। কিন্তু এই রিপোর্ট স্কুলে বা ছাত্রছাত্রীদের কাছে তো যাবেই না, বরং খুবই গোপন রাখা হয়েছে। এই রিপোর্ট এমনকী শিক্ষক সংগঠনগুলিকেও দেওয়া হচ্ছে না, যদি তাদের কীর্তিকলাপ আরও ফাঁস হয়ে যায়। ২০০৬ সালের ডিএটি পরীক্ষা জানুয়ারি মাসে নেওয়া হলেও এর অ্যানালিসিস রিপোর্ট অদ্যাবধি বেরোয়নি। এছাড়া পরীক্ষা গ্রহণের সময় এবং এর কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তো আছেই। সর্বোপরি এই পরীক্ষাটির কোন সার্থকতা সরকার প্রমাণ করতে পারেনি। বাস্তবে এটিও প্রহসন ব্যতীত অন্য কিছু নয়। বেসরকারি জনপ্রিয় বৃত্তি পরীক্ষাটিকে বানচাল করার উদ্দেশ্য ভিন্ন অন্য কোন দিক এর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

সরকারের কাছে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, বৃত্তিসহ বৃত্তি পরীক্ষা চালু করার এবং প্রাথমিক স্তরে পাশ-ফেল প্রথা চালু করার। কিন্তু তারা সেদিকে কর্ণপাত করেননি। কেন? কোন সদুত্তর না দিলেও একটা বিষয় আজ জনসাধারণের কাছে পরিস্ফুট হচ্ছে, তা হল, এই সরকার আজ চলছে মালিকদের অঙ্গুলিহেলনে। বিশ্বায়নের দোহাই দিয়ে এরা আজ সাম্রাজ্যবাদীদের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য নিতে মরিয়া। যেমন নিয়েছে ডিপিইপি'র নামে কোটি কোটি টাকা, যেমন নিয়ে চলেছে সর্বশিক্ষার নামে কোটি কোটি টাকা। ইংরেজি ভাষা শিক্ষার সময় এরা সাম্রাজ্যবাদী ভূত দেখেছিল, কিন্তু টাকা লুটবার সুযোগের বেলায় ভূত লোপাট। তাই দু'হাত ভরে টাকা নিচ্ছে তারা। সাম্রাজ্যবাদীদের শর্ত — নো ডিটেনশন অর্থাৎ একই শ্রেণীতে দু'বছর কোন শিক্ষার্থীকে আটকে রাখা চলবে না। তাহলে ক্ষতি। প্রচুর অর্থের অপচয়। তাই শিক্ষার মান গোল্লায় যাক, নামকাওয়াস্তে তাড়াতাড়ি সকলকে সাক্ষর কর। পাশ-ফেল প্রথা তুলে দাও।

সেই হুমকি বর্তমানে শুধু প্রাথমিকে আবদ্ধ নেই, প্রাথমিকের পর আজ মাধ্যমিক স্তরেও এসে গেছে। এখানেও সেই গ্রেডেশন প্রথা চালুর ঘোষণা। মাধ্যমিকের ফলাফলেও গ্রেডেশন, উচ্চ-মাধ্যমিকেও তাই। অর্থাৎ সব মিলিয়ে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের পায়ে দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে জলাঞ্জলি দিয়ে এরা গদি টিকিয়ে রাখতে তৎপর।

তাই শিক্ষার স্বার্থে, শিক্ষাকে বাঁচাতে, শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য এই সর্বনাশা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলনকে আরও জোরদার করে তুলতে হবে। দেশের কোটি কোটি কোমল নিষ্পাপ শিশুর জীবন বাঁচাতে এই সংগ্রামই একমাত্র পথ।

প্রাণ যায় যাক, জমি ছাড়ব না — সিঙ্গুরের কৃষকদের দৃঢ় অঙ্গীকার

একের পাতার পর

সন্তানদের শিক্ষার খরচ জোগায়— সেই জমি কেড়ে নিয়ে সরকার তুলে দিচ্ছে পুঁজিপতিদের হাতে। পুঁজিপতিরা সেই জমিতে শিল্পের নামে গড়ে তুলবে ধনীদের আবাস ও বিলাসের আয়োজন। চাকরি ও ক্ষতিপূরণ দেবার সরকারি প্রতিশ্রুতিতে চাষীরা বিশ্বাস করছে না। আবার সেই চাকরি ও ক্ষতিপূরণ পেলেও চাষী পরিবারগুলি যে তার দ্বারা বাঁচবে না — তাও চাষীদের কাছে পরিষ্কার। তাই চাষীরা আজ জেলায় জেলায় মরণ-বাঁচন সমস্যার সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ প্রতিরোধে সামিল হচ্ছে।

রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা চাষীরা যখন কামারকুণ্ডু স্টেশন থেকে সুশৃঙ্খল মিছিলে দীর্ঘপথ হাঁটছিল, তাদের বিস্মিত দৃষ্টি ঘুরছিল রাস্তার দুপাশের বিস্তীর্ণ সবুজ ধানের খেতে। খেতের সুপুষ্ট ধান গাছগুলো দুলছে হাওয়ায়, সেই দোলা মিছিলকারী কৃষক-শ্রমিকদের বুকের মধ্যে তুলছিল আলোড়ন। তাদের সকলেরই বিস্মিত প্রশ্ন—তিন-চার ফসলি এমন উর্বর জমি ধ্বংস করে এখানে মাথা তুলবে বহুতল বাড়ি! চাষীর জমি কেড়ে নিয়ে, তাদের পেটের ভাত মেরে দিয়ে সেই জমিতে বড়লোকদের স্ফূর্তি মেটানোর আয়োজন হবে!

সিঙ্গুরের মানুষ কিন্তু সোচ্চারে জানিয়ে দিয়েছে, এত বড় সর্বনাশ তারা কিছুতেই হতে দেবে না। সিঙ্গুরের বাইরে দক্ষিণবঙ্গ থেকে আসা কৃষক-শ্রমিকদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে সিঙ্গুরের চাষী ও চাষী-রমণীরা, বইয়ের ব্যাগ পিঠে ঝুলিয়ে স্কুল ছাত্রছাত্রীরা মিছিল করে দলে দলে এসে হাজির হয়েছিল হাসপাতাল ময়দানের বিশাল সমাবেশে। তাদের চোখমুখের অভিব্যক্তি, তাদের প্রতিবাদের ভাষা, তাদের মিছিলে হাঁটার দৃপ্ততা— সব কিছুর মধ্যে ফুটে উঠছিল সংগ্রামের আগুন। এই সংগ্রামে পরাজয় মানেই তাদের তিন-চার ফসলি অতি-উর্বর জমির উপর গড়ে উঠবে বড়লোকদের জন্য আবাসন। তার মানে অনাহারে তাদের সপরিবারে মৃত্যু। তারা কি না লড়ে পারে! তাই তারা সংঘবদ্ধ হয়েছে। গড়ে তুলেছে 'সিঙ্গুর কৃষিজমি রক্ষা কমিটি'। উত্তর বাজেমেলিয়া গ্রামের বিশ্বজিৎ খাঁড়াকে যখন প্রশ্ন করা হল— আপনাদের গ্রামে কৃষিজমি রক্ষা কমিটির সংগঠন কেমন? তিনি জবাব দিলেন, 'পুরো গ্রামটাই তো সংগঠন। কেউ বাইরে নেই। দল-মত যার যা-ই হোক, নিজেদের জমি বাঁচাতে সবাই আমরা এক সংগঠনে এসেছি।' যখন বলা হল যে, 'সরকার তো বলছে শিগগির সব জমির দখল নেবে।' তিনি বললেন, 'আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক তো, না কি! আমার জমি আমি বেচব কি না সে স্বাধীনতা আমার থাকবে না? আমরা আলু চাষ করার জন্য তৈরি হচ্ছি। আলুর বীজ, রাসায়নিক সার বাড়িতে সব এসে গেছে।'

মিছিলে হাঁটছিলেন বেড়াবেড়ি পূর্বপাড়ার বন্দনা বাগ, দীপ্তি পাল, শ্যামলী দাস, বাজেমেলিয়ার লক্ষ্মী দে। ২৫ সেপ্টেম্বর পুলিশি অত্যাচারে শ্যামলী ছিটকে গিয়ে পড়েছিলেন একটা ড্রেনের মধ্যে। বন্দনা মার খেয়ে জেলে গিয়েছিলেন। সরকার চাকরি দেবে, টাকা দেবে বলছে, তবু তারা আন্দোলনে কেন — প্রশ্ন করতেই তাঁরা উত্তেজিত— ক' জনকে চাকরি দেবে? কত টাকাই বা দেবে? বাড়ির এক ছেলেকে চাকরি দিলে আর ছেলেরা কী করে বাঁচবে? একজন বলেছেন, আমাদের জমির ৬ জন অংশীদার, ৬ জনকে কি চাকরি দেবে? যে টাকা দেবে তাতে আমরা মানুষের মত বাঁচতে পারবো? আমাদের এমন উর্বর জমি হারিয়ে ঐ টাকা ও চাকরিতে আমাদের দিন চলবে? জমি আমাদের বংশপরম্পরায় খাওয়া-পরা দেয়, চাকরি কি তা দেবে? আর চাকরি হলেও দু'দিন বাদে যে ছাঁটাই করে দেবে না তার গ্যারান্টি কোথায়? টাটারা নিজেরাই তো জামশেদপুরে তাদের কারখানায় হাজার হাজার কর্মীকে ছাঁটাই করে দিয়েছে। তাছাড়া, টাটা কী চাকরি দেবে শুনি? ওদের হাত-পা টেপার চাকরি? অপরজন বললেন, এ জমিতে বছরে পাঁচবার চাষ হয়। কী ফলে না এ জমিতে? ধান, গম, আলু, শাক-সবজি সবকিছু। ৬ মাস ধরে আন্দোলন করে জমি আগলে রেখেছি। সরকার নোটিশ জারি করতে এসেছিল আমরা ফিরিয়ে দিয়েছি। দীপ্তি পাল বললেন, আমরা সপ্তাহে ৩ বার পালা করে মিছিল করি। আমার এক বছরের ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে পথে-ঘাটে, জমির আল-বাঁধে স্লোগান দিয়ে ঘুরি, জমি পাহারা দিই।

জমির সংগ্রামে জেল খাটা হারুবালা দাস, পুলিশের মার খাওয়া সুচিত্রা দাস, তরুণী মায়া দাস তাঁদের বলিষ্ঠ হাতগুলো ঊর্ধ্বে তুলে স্লোগানের ভঙ্গিতে শুনিয়ে দিলেন তাঁদের দৃপ্ত শপথ 'মাটি-জমি মা, ওকে ছাড়ব না'। পুলিশের মার খেয়ে জেলে যাওয়া রিক্সাচালক অহীন কোলে। ১০ কাঠা চাষের জমি তাঁর। বললেন, 'যত যা-ই হোক, জমি আমরা দেব না।' সঙ্গে আসা পুত্র সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র সোমনাথ বলল, ' সিপিএম নেতারা হুমকি দিচ্ছে, পুলিশ পাড়ায় পাড়ায় হানা দিচ্ছে, কিন্তু আমরা ভয় পাচ্ছি না, আন্দোলনে আছি।'

সরকার বলছে যে, তারা নাকি আশি শতাংশ চাষীর থেকে জমি পেয়ে গেছে! এ কথা বলতেই বাজেমেলিয়া ঘোষপাড়ার একাদশ শ্রেণীর ছাত্র তুষার ঘোষ বলে উঠল, 'সরকার মিথ্যা প্রচার করছে।' লতিকা কোলে তো ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, 'কই, বলুক তো আমার সামনে, দাঁত খুলে নেব।' জমির দালাল রাজ্য সরকার ও সিপিএমের প্রতি কী তীব্র ঘৃণা! বেড়াবেড়ি পূর্ব পাড়ার কৃষ্ণা বাগ ২৫ সেপ্টেম্বর পুলিশি অত্যাচার সয়েছিলেন, দুবছরের শিশুকন্যা সহ তাঁকে জেলেও পাঠানো হয়েছিল। বললেন, 'সিপিএমের সবাইও জমি দেয়নি। তারা আমাদের সঙ্গে আন্দোলনে আছে। যারা শহরে থাকে, জমির সঙ্গে যাদের সম্পর্কই নেই, তাদের মধ্যে কেউ কেউ জমি লিখে দিয়েছে। আর, বহু বছর আগে জমি বিক্রি করে দিলেও তবু সরকারি রেকর্ডে যাদের নাম থেকে গেছে, সিপিএম তাদের গিয়ে বলছে, সরকারি রেকর্ডে তোমার জমি, তুমি ওটা সরকারকে লিখে দাও। তারা কেউ কেউ লিখে দিচ্ছে, টাকার চেক নিচ্ছে। প্রকৃত চাষীরা দেয়নি।' অমিয় ঘোষ বললেন, 'খাসের ভেড়ি গ্রামে ভুল বুঝিয়ে সিপিএম যাদের জমি লিখিয়ে নিয়েছিল, এখন তারা ভুল বুঝতে পেরে আমাদের আন্দোলনে যোগ দিয়েছে।'

সরকার জমি দখল করতে এলে প্রতিরোধ করবেন তো? প্রশ্ন শুনে উজ্জ্বল পরামানিক অবাক হয়ে বললেন, 'প্রতিরোধ করব কী! প্রতিরোধ তো করছিই। গত ৬ মাস ধরে চলছে। নইলে কবে দখল করে নিত।'

গলায় কণ্ঠির মালা অষ্ট অধিকারী বললেন, 'আমার জমি নেই, পাড়ায় পাড়ায় নামগান করি, তাতেই সংসার চলে। যজমানদের জমি চলে গেলে আমার সংসার কে দেখবে?' ৭০ বছরের বৃদ্ধা সতী দাসও এসেছেন মিছিলে। বললেন, 'ক' দিন আর বাঁচবো! পূর্বপুরুষের রেখে যাওয়া এই মাটি রক্ষা করতে না হয় পুলিশের বিরুদ্ধে লড়াই করেই মরব।'

সিঙ্গুরের বিভিন্ন গ্রাম থেকেও দলে দলে মিছিল এসে যোগ দেয় সেই মিছিলে। হাতে ব্যানার, কণ্ঠে স্লোগান ঃ 'টাটার দালাল সিপিএম জেনে রেখো — শিল্পায়নের ধোঁকা দিয়ে চাষীর জমি কেড়ে নেওয়া যাবে না', 'পুঁজিপতি ও টাটার অশুভ আঁতাত ধ্বংস হোক'। পথের দু'ধারে বাড়িগুলি থেকে চাষী-রমণীরা বাড়ির কাজ ফেলে সামিল হয়েছেন সেই মিছিলে। মিছিলের একেবারে শেষে কয়েকজন সাংবাদিক ও আলোকচিত্রী হাঁটছিলেন। আলুথালু পোষাকে এক প্রৌঢ়া তাঁদের দিকে এগিয়ে এলেন। দেখে মনে হবে— কোন আপনজনের বিয়োগ ব্যথায় এখনো মুহ্যমান। এক সাংবাদিককে টেনে নিয়ে গেলেন মাঠের ধারে— সবুজ ধানগাছের ঢেউ। তাঁদের ৪ বিঘা জমির এলাকা দেখিয়ে বুক চাপড়ে কাঁদতে লাগলেন, বললেন, 'এ জমি চলে গেলে তিন ছেলে, নয় নাতি-নাতনি নিয়ে আমরা কী করে বাঁচবো বাবু!

চোখ মুছে হেঁটে চললেন সংহতি সমাবেশে যোগ দিতে।

চড়া রোদের মধ্যেই মিছিল যখন হাসপাতাল ময়দানে এসে প্রবেশ করে তখন লাল কাপড়ে মোড়া মঞ্চের পাশে নানা ব্যঙ্গচিত্র আঁকা, দাবি-ব্যানারে আন্দোলনের বক্তব্য খোদাই করা। পাশে সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তা ও বক্তব্য সম্বলিত পুস্তক বিক্রির স্টল। মুহূর্তের মধ্যে মাঠ আক্ষরিক অর্থেই কানায় কানায় ভরে ওঠে। পাশাপাশি বাড়ির ছাদ, জানালায়ও ভিড়। তবু মিছিল বহুদূর রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে গেছে। সভাস্থলে ঢোকার উপায় নেই।

সভার শুরুতেই সঙ্গীতগোষ্ঠীর সঙ্গীতে ফুটে ওঠে সংগ্রামী চাষী-মজুরের মনের কথা ঃ 'সালিম আসুক, টাটা আসুক, আর যত ব্যাটা আসুক / জান দেব, দেব না জমিন।' সামনে শ্রোতার আসনে বসা সংগ্রামী কৃষক বধূ ও কৃষক কন্যারা সঙ্গীতের তালে তালে মাথা নাড়িয়ে তাদের সমর্থন জানাতে থাকে। এ যে তাদেরই প্রাণের কথা, তাদেরই অন্তরের শপথ। চোখ তাদের চক্ চক্ করে ওঠে।

২৫ সেপ্টেম্বর পুলিশি অত্যাচারে জমি রক্ষার আন্দোলনে প্রথম শহীদ রাজকুমার ভুল-এর স্মৃতিবেদীতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন এস ইউ সি আই কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড অনিল সেন, কমরেড প্রভাস ঘোষ ও কমরেড অসিত ভট্টাচার্য এবং সিঙ্গুর কৃষিজমি রক্ষা কমিটির অন্যতম নেতা মানিক দাস। সভা পরিচালনা করেন সিঙ্গুরের চাষী আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক শিক্ষক সঞ্জীব ভট্টাচার্য।

সিঙ্গুরের জমি রক্ষার আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করার আহ্বান জানিয়ে একটি প্রস্তাব পাঠ করেন সিঙ্গুর কৃষিজমি রক্ষা কমিটির অন্যতম আহ্বায়ক, স্থানীয় এস ইউ সি আই সংগঠক কমরেড শঙ্কর জানা। সিঙ্গুরের এস ইউ সি আই সংগঠক কমরেড তপন দাস প্রস্তাবের সমর্থনে আবেগপূর্ণ তেজোদীপ্ত বক্তব্যে বলেন, 'এলাকার সর্বস্তরের মানুষ জমিরক্ষার আন্দোলনে সামিল, মা কোলে শিশু সহ ৭০-৮০ বছরের বৃদ্ধ-বৃদ্ধারাও মিছিলে হাঁটছেন, প্রতিবাদ-প্রতিরোধে সামিল হচ্ছেন। পাড়ায় পাড়ায় গড়ে উঠছে ছাত্র কমিটি, যুব কমিটি, মহিলা কমিটি। প্রতি ১০ জনে একজনকে ইনচার্জ করা হয়েছে। প্রতিরোধের জন্য সিঙ্গুরের মানুষ তৈরি।' এরপর সভার হাজার হাজার জনতা হাত তুলে প্রস্তাবটিকে সমর্থন জানালে বিপুল করতালি ধ্বনির মধ্য দিয়ে প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

প্রধান বক্তা কমরেড প্রভাস ঘোষ তাঁর ভাষণে সংগ্রামের পথনির্দেশ তুলে ধরেন। আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সংহতি সমাবেশের কাজ শেষ হয়।

দলে দলে চাষী-শ্রমিক-ছাত্র-যুব-মা-বোন

সাতের পাতায় দেখুন

সংগঠিত লড়াইয়ের জন্য গ্রামে গ্রামে গণকমিটি গড়ে তুলুন

ছয়ের পাতার পর

এবার ফিরে চলে নিজ নিজ এলাকায়। ফিরে চলেছেন সাংবাদিক ও আলোকচিত্রীরা। হঠাৎ একটি শিশুকণ্ঠ তাঁদের আকৃষ্ট করে। রাস্তার ধারে বাড়ির দরজার সামনে দাঁড়িয়ে শিশুটি লাফাচ্ছে, আর সুর করে আপন মনে আবৃত্তি করছে, 'জান দেব, তবু জমি দেব না'। বাইরে থেকে যাওয়া সাংবাদিকরাও বুঝে যান সিঙ্গুরের জমি রক্ষার লড়াই শুধু পথে-ঘাটে-মাঠে নয়, গৃহের অন্তঃপুরেও। উত্তর বাজেমেলিয়ার বিশ্বজিৎ ঠিকই বলেছিলেন, 'পুরো গ্রামটাই তো প্রতিরোধ সংগঠন'।

স্টেশনে দুই যুবক এক চায়ের দোকানদারকে বলছিল, তুমি জমির আন্দোলনে আছ কেন? তোমার ক' কাঠাই বা জমি! তুমি সরকারকে জমি লিখে দিয়ে চেক নিয়ে নাও। দোকানদার অনেকক্ষণ চুপ করে শুধু শুনছিলেন। শেষে বললেন, 'ভুলে যেও না, এই আন্দোলনে এস ইউ সি আই আছে, ওরা শেষ না দেখে ছাড়ে না।'

কমরেড প্রভাস ঘোষের ভাষণ

কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, আপনাদের এই আন্দোলন কেবল সিঙ্গুরের কয়েকটি মৌজার কৃষকদের আন্দোলন নয়, পশ্চিমবঙ্গের জনগণ, গোটা ভারতবর্ষের জনগণ মনে করে, এই আন্দোলন তাদের আন্দোলন। সিঙ্গুরের চাষীরা গত ছয় মাস ধরে লড়াই চালিয়ে সিপিএম-ফ্রন্ট সরকারের সকল চক্রান্ত ও আক্রমণকে পরাস্ত করে জমি অধিগ্রহণ ঠেকিয়ে দিয়েছেন, যা আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য। এই দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ না থাকলে সরকার অনেক আগে জমি কেড়ে নিত।

তিনি বলেন, একসময় এই বাংলায় গ্রামের কৃষকরা আন্দোলন করেছে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের জন্য, বেনাম জমি দখল, ভাগচাষীদের ন্যায্য ভাগ, খেতমজুরদের ন্যায্য মজুরির জন্য। এখন হচ্ছে একটা নতুন আন্দোলন — সরকার কৃষকদের জমি কেড়ে নিয়ে পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দিচ্ছে; একে রুখতে হবে। শুধু সিঙ্গুরেই নয়, গোটা পশ্চিমবাংলায় ৯৪ হাজার ৭৫২ একর কৃষিজমি দখল করার পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার, সর্বত্র চাষীদের উচ্ছেদ করা হবে। সরকার বলছে, এই বিপুল পরিমাণ কৃষিজমিতে দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিরা নাকি শিল্প গড়বে।

শিল্পায়ন সম্পর্কে সরকারি প্রচারকে ডাহা মিথ্যাচার আখ্যা দিয়ে কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, শিল্পায়ন কথাটার অর্থ হচ্ছে লাগাতার শিল্প কলকারখানার প্রতিষ্ঠা। আজ থেকে ২০০ বছর আগে পশ্চিমী দুনিয়ায় এ জিনিস ঘটেছিল, যাকে বলা হয়েছিল শিল্পায়ন। এ রাজ্যেও একসময় গঙ্গার দু'ধারে অনেক কলকারখানা গড়ে উঠেছিল। এখন সেসব শিল্পের হাল কী ? একটার পর একটায় লালবাতি জ্বলছে, চলছে লক আউট, ক্লোজার। এ রাজ্যেই ৫৫ হাজার ছোট-বড় কারখানা বন্ধ, ১৫ লক্ষ শ্রমিক-কর্মচারী ছাঁটাই হয়েছে। এ কি শিল্পায়ন ? আজই সংবাদ বেরিয়েছে, রেলে ১৭০০ চাকরির জন্য ১০ লক্ষ আবেদন জমা পড়েছে। এই সিপিএম সরকার হলদিয়া পেট্রোকেম নিয়ে প্রচার করেছিল, লক্ষ লক্ষ বেকারের চাকরি হবে। বাস্তবে এখন সেখানে কাজ করে মাত্র ৮৪২ জন।

তিনি বলেন, টাটা-আম্বানি বা অন্য কোনও দেশি-বিদেশি পুঁজিপতি কোথাও এবং এরাজ্যেও দাক্ষিণ্য করতে আসছে না, সর্বোচ্চ মুনাফা করাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য। এবং সেজন্য তারা আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করবে, যার অর্থ হচ্ছে শ্রমিক-কর্মচারীর সংখ্যা হবে নিতান্ত সামান্য; চাষী, বর্গাদার, খেতমজুরদের সেখানে কোন কাজই জুটবে না। যে টাটার কারখানায় প্রচুর কাজ হবে বলে প্রচার করা হচ্ছে, জামসেদপুরে সেই টাটার কারখানার হাল কী ? আগে সেখানে কাজ করতেন ৭৮ হাজার শ্রমিক-কর্মচারী, ছাঁটাই হতে হতে এখন সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪২ হাজার। টেলকোতে আগে কাজ করতেন ২২ হাজার কর্মচারী, এখন করেন মাত্র ৭ হাজার। এই টাটারা কৃষিজমি নিয়ে শিল্প গড়ে হাজার হাজার মানুষকে কাজ দেবে — একথা বিশ্বাস করা কি সম্ভব ?

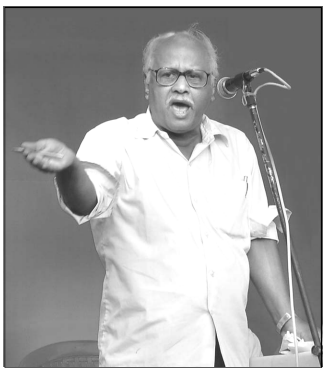

সিঙ্গুরের সভায় বক্তব্য রাখছেন কমরেড প্রভাস ঘোষ

তিনি বলেন, এই জেলাতেই হিন্দমোটরে বিড়লার মোটরগাড়ির কারখানা একসময় ৭৭৪ একর জমিতে গড়ে উঠেছিল। বিড়লারা তার মধ্যে ৩১০ একর জমিতে ইতিমধ্যেই আবাসন গড়ে তুলছে, বিক্রি করে লাভ করার জন্য। বাস্তব সত্য হচ্ছে, পুঁজিবাদী বাজার অর্থনীতিতে প্রবল সঙ্কট, পণ্য বিক্রির বাজার নেই, শিল্পে মন্দা, ফলে পুঁজিপতিরা পুঁজি ঢালবে কোথায় ? একদিকে শেয়ারের ফাটকায়, অন্যদিকে ব্যাঙ্ক-বীমা প্রভৃতি অর্থলগ্নীর ব্যবসা, আর রিয়েল এস্টেট বা আবাসন ও উপনগরী নির্মাণে। দেশের একটা অংশের মানুষের হাতে এখন প্রচুর টাকা। মালিকশ্রেণী, বড় বড় ব্যবসায়ী, বিভিন্ন সংস্থার বড় বড় অফিসার, শাসকদলের নেতা-মন্ত্রীদের হাতে এখন কোটি কোটি টাকা। এদের জন্য গড়ে উঠছে আধুনিক উপনগরী যেখানে ধনীদের জন্য সবরকম ব্যবস্থা থাকবে। দামী স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল, সুইমিং পুল, শপিং মল, বার-নাইটক্লাব সবই থাকবে। এই হচ্ছে আবাসন শিল্প। গ্রামাঞ্চলে কৃষিজমি দখল করে এসব হলে, তার কুপ্রভাবে গ্রামে গ্রামে সুস্থ সংস্কৃতির যতটুকু পরিবেশ আজও আছে, তাও ধ্বংস হয়ে যাবে।

কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, টাটাদের কারখানা কি বন্ধ কারখানার জমিতে হতে পারে না ? অনাবাদি পতিত জমিতে হতে পারে না ? এ রাজ্যে অনাবাদি পতিত জমি পড়ে আছে ২ লক্ষ ৭৭ হাজার ৮০৫ একর। বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, পুরুলিয়ায় তারা যাচ্ছে না কেন ? সেখানে জল, বিদ্যুৎ, পরিবহন সবই আছে। যাবে না, জমি চাই কলকাতার কাছেই। এখানে বাড়ি বেচে বেশি লাভ করবে, বিড়লারা হিন্দমোটরে যেমন করছে। এ জিনিস কি মেনে নেওয়া যায় ? এই সিঙ্গুরে এখন যাদের জমিতে টাটা হাত দেয়নি, তারা নিজেদের আদৌ নিরাপদ মনে করবেন না। কিছুকাল পরে তাদেরও ধরে টান দেবে। ফলে এই লড়াই সমগ্র কৃষকসমাজেরই।

সিপিএম বলছে, বিধানসভায় তারাই গরিষ্ঠ, অতএব, জনগণের রায় তাদের পক্ষেই আছে। ভোট এখন কীভাবে হয়, জনগণ তা জানেন। তাছাড়া গত ভোটের আগে কি সিপিএম নেতারা বলেছিলেন, ভোটে জিতলে তারা কৃষকদের জমি কেড়ে নেবেন ? কৃষিজমি কেড়ে নেওয়ার প্রশ্নে জনগণের রায়ের কথা বললে ৯ অক্টোবরের বন্‌ধের কথা বলতে হয়। আপনারা জানেন, কৃষিজমি কেড়ে নেওয়ার প্রতিবাদে ওইদিন তৃণমূলও বন্‌ধ ডেকেছিল, আমাদের দলও ডেকেছিল। এই বন্‌ধ সফল করার জন্য হাজারে হাজারে এস ইউ সি আই কর্মী প্রচারে নেমেছিল। বন্‌ধ হয়েছে সর্বাত্মক, যার মধ্য দিয়ে জনগণ সরকারি নীতির বিরুদ্ধেই রায় দিয়েছে। গণতান্ত্রিক ন্যায়নীতি থাকলে এই রায় তো সরকারের মেনে নেওয়াই উচিত ছিল। মন্ত্রীরা বলছেন, টাটাদের সাথে কী শর্তে চুক্তি হয়েছে, তা জানানো হবে না, ওটা ট্রেড সিক্রেট। জানা গেছে কার্যত বিনামূল্যে জমি দেওয়া হবে। তবে কি কাটমানির খেলা আছে? সেটাই কি ট্রেড সিক্রেট?

তিনি বলেন, সিপিএম-এর হাতে লাল পতাকা দেখে ওদের মার্কসবাদী ভেবে ভুল করবেন না। সিপিআই এবং পরে তা ভেঙে তৈরি হওয়া সিপিএম কোনদিনই মার্কসবাদী দল ছিল না। সদ্য ডানলপ কারখানা খোলার অনুষ্ঠানে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বলেছেন, মালিক-শ্রমিক বন্ধুত্ব চাই। মার্কসবাদ কোনদিন একথা বলেনি। বরং মার্কসবাদের শিক্ষা হ'ল, মালিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রমিকের শ্রেণীসংগ্রাম ক্রমাগত তীব্র করতে হবে। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সোস্যাল ডেমোক্র্যাটরা, যারা শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের বিরুদ্ধে বুর্জোয়াশ্রেণীর সাথে সমঝোতাও করেছে, তারাও কখনও মালিক-শ্রমিক বন্ধুত্বের কথা বলেনি, যা এখন সিপিএম বলছে। পুরনো প্রবাদ যেমন আছে 'মক্কায় গেলেই হাজি হয় না', 'গেরুয়া পরলেই সন্ন্যাসী হয় না', তেমন আপনাদের বুঝতে হবে — হাতে লালঝাণ্ডা থাকলেই মার্কসবাদী হয় না। সিপিএম-কে দেখে মার্কসবাদের বিরুদ্ধতা করলে আপনারা ঠকবেন।

কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, এই অঞ্চলে আমাদের দলের সাংগঠনিক শক্তি খুব বেশি নয়। যতটুকু আছে, তা নিয়েই আমাদের কর্মীরা প্রথম দিন থেকেই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। আপনাদের কাছে আবেদন জানিয়ে বলেছিল, শুধু হা-হুতাশ করে, চোখের জল ফেলে কিছু হবে না, প্রতিরোধ করতে হবে। আমাদের কর্মীরা নানা গ্রামে গণকমিটি, ছাত্রকমিটি, যুবকমিটি গড়েছে, এগুলোই সংগঠিত আন্দোলনের শক্তি। আমরা যেখানেই আন্দোলন গড়ে তুলি, এভাবেই জনগণকে সংঘবদ্ধ করার চেষ্টা করি। আপনারা জানেন, ১৯ বছর আন্দোলন করে আমরা প্রাথমিকে ইংরেজি ফিরিয়ে আনতে সরকারকে বাধ্য করেছি, কৃষি-বিদ্যুৎ মাশুল কমাতে, হাসপাতালের চার্জ, স্কুলের বেতন, ট্যাক্স কমাতে বাধ্য করেছি। এই এখনই সংবাদ পেলাম কুলতলিতে দীর্ঘ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আজ কর্তৃপক্ষকে সকল দাবি মেনে নিতে বাধ্য করা গেছে। এটাই পথ, একমাত্র আন্দোলনই পারে উদ্ধত সরকারের মাথা নিচু করাতে।

এ প্রসঙ্গে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে তিনি বলেন, আজ মুখে আন্দোলনের কথা অনেকেই বলছে। এই সিপিএম এ রাজ্যে কৃষকের জমি কেড়ে নিচ্ছে, কিন্তু অন্য রাজ্যে তারা ক্ষমতায় নেই, সেখানে কৃষিজমি দখলের বিরোধিতা করছে। অন্যদিকে যে কংগ্রেস অন্যান্য রাজ্যে কৃষিজমি দখল করে পুঁজিপতিদের দিচ্ছে, তারাই এরাজ্যে কৃষিজমি দখলের বিরুদ্ধতা করছে। একই চরিত্র বিজেপি, সমাজবাদী পার্টি বা কংগ্রেস ও এনডিএ-জোটের অন্যান্য শরিকদের। এই দ্বিচারিতার পিছনে রয়েছে ভোটের রাজনীতি। এদের সকলেরই লক্ষ্য গদি দখল। সেজন্য যেখানে যেমন বলা ও করা দরকার, তাই করছে। এরা কখনও যথার্থ আন্দোলনের পার্টি হতে পারে না। আজ কৃষকের জমিরক্ষার আন্দোলনে মূল শত্রু পুঁজিবাদ তথা পুঁজিপতিশ্রেণী। সরকার তো পুঁজিপতিদেরই এজেন্ট বা পলিটিক্যাল ম্যানেজার। এই অবস্থায় কেউ যদি বলে, আমি সিপিএম-এর বিরুদ্ধে বলব, কিন্তু টাটার বিরুদ্ধে বলব না, আম্বানির বিরুদ্ধে বলব না, টাটা-আম্বানি আমার বন্ধু, আমি পুঁজিপতিদের সঙ্গে বৈঠক করে বোঝাব, তবে সেটা হবে ভণ্ডামি। এই দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে লড়াই হবে না। আজ মূল লড়াই পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে। চাই এমন পার্টি, যারা পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে লড়ে, যে পার্টি শেষ পর্যন্ত লড়াই চালায়। ভোটের দিকে, মন্ত্রীর চেয়ারের দিকে তাকিয়ে নয় — শোষিত মানুষের স্বার্থের দিকে তাকিয়ে যারা সংগ্রাম করে। তার জন্য চাই নৈতিক শক্তির জোর। আপনারা জানেন, এস ইউ সি আই কর্মীরা লাঠি-গুলি খেয়েও লড়াই করে যায়। তাদের সেই নৈতিক শক্তি আছে, যেটা একমাত্র মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাই দিতে পারে। এটাই এস ইউ সি আই-এর নৈতিক শক্তির উৎস।

পরিশেষে কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, এই লড়াইয়ে আপনারা জিতে আছেন, এভাবে সংগঠিত লড়াই চালিয়ে গেলে আপনারা জিতবেনই। পুরুষানুক্রমে যে জমি আপনারা পেয়েছেন, তা ছেড়ে দিলে পূর্বপুরুষদের কাছে অপরাধী হবেন। এ জমি চলে গেলে আপনারা পথের ভিখারি হয়ে যাবেন। জমি দখল করতে এলে আপনারা প্রাণ দিয়ে লড়বেন একথা জানি, কিন্তু আপনারা একা থাকবেন না, গোটা পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে পাশে পাবেন। আমাদের দল সর্বশক্তি দিয়ে আপনাদের পাশে থাকবে, শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে আমরা লড়াই করব।

সিঙ্গুরে পালিত হল শহীদ ভগৎ সিং জন্মশতবর্ষ

এস ইউ সি আই দলের সিঙ্গুর লোকাল কমিটির ছাত্রকর্মীদের উদ্যোগে গত ২৫ অক্টোবর ডি ডি ভারতী বিদ্যালয়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় শহীদ-এ-আজম ভগৎ সিং-এর জন্মশতবর্ষ পালিত হল। এই উপলক্ষে 'ভগৎ সিং-এর জীবন সংগ্রাম চর্চার প্রাসঙ্গিকতা ও কৃষিজমি রক্ষা আন্দোলনে ছাত্র-যুবদের ভূমিকা' প্রসঙ্গে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সিঙ্গুর কৃষিজমি রক্ষা আন্দোলনের শতাধিক সংগ্রামী ছাত্র-যুবক-মহিলা-কৃষক এই আলোচনা সভায় অংশ নেন।

সভায় আলোচনা করেন এস ইউ সি আই কলকাতা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য। উপস্থিত ছিলেন এস ইউ সি আই হুগলি জেলা কমিটির সদস্য কমরেড সন্তোষ ভট্টাচার্য, এ আই ডি এস ও হুগলি জেলা কমিটির সভাপতি কমরেড তপন দাস, সম্পাদক কমরেড দীপক সিংহ প্রমুখ।

চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য তাঁর বক্তব্যে — ভগৎ সিং সহ এদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের আপসহীন ধারার বিপ্লবীদের সংগ্রামলব্ধ চরিত্র থেকে শিক্ষণীয় গুণাবলী আহরণ করে বর্তমান আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য পাড়ায় পাড়ায় ভলান্টিয়ার বাহিনী গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

উপস্থিত ছাত্র-যুব-মহিলা-কৃষকদের মধ্য থেকে গ্রামের বিশিষ্ট কৃষক রাম কোলে, কৃষক রমণী মায়া ঘোষ, কাজল দাস প্রমুখ সিঙ্গুরের কৃষিজমি রক্ষা আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে আন্দোলনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে নানা প্রশ্ন রাখেন। কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য সেগুলি নিয়ে আলোচনা করেন এবং কৃষিজমি রক্ষা আন্দোলনসহ যে কোন অন্যায়ের বিরুদ্ধে মানুষ হিসাবে প্রতিবাদ করার আবেদন জানান।

R. No 5268 / 60
Postal Registration No. SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06

সরকারি অবহেলায় বি সি রায় হাসপাতালে শিশু মৃত্যু বিক্ষোভে এস ইউ সি আই

স্রেফ সরকারি অবহেলায় বি সি রায় হাসপাতালে চারদিনে ২৩টি শিশুর মৃত্যু ঘটল। আরও ৪০টি শিশু আশঙ্কাজনক অবস্থায় রয়েছে। ২০০২ সালে এই হাসপাতালে ২৪ ঘন্টায় মারা গিয়েছিল ১০টি শিশু। ২০০৫ সালেও মারা

৫ নভেম্বর বি সি রায় হাসপাতালের সামনে এস ইউ সি আই-এর বিক্ষোভ

গিয়েছিল ১০ দিনে ২০টি শিশু। বারবার শিশুমৃত্যুর ঘটনা ঘটলেও সরকার ও তার স্বাস্থ্যদপ্তর উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়নি। ২০০২ এবং '০৫ সালে যখন এতগুলি শিশু মারা গিয়েছিল সেই সময় আন্দোলনের চাপে সরকার বলতে বাধ্য হয়েছিল, হাসপাতালে ভেন্টিলেটার বসানো হবে, ইনটেনসিভ নিওনেটাল কেয়ার ইউনিট চালু করা হবে, ৭৫টি অতিরিক্ত শয্যার ব্যবস্থা করা হবে, হাসপাতালের জন্য পৃথক বিদ্যুৎ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। সরকার বাস্তবে কিছুই করেনি। ফলে সরকারি অবহেলাতেই এতগুলি মায়ের কোল শূন্য হ'ল। এদিকে রাজ্যজুড়ে ভয়াবহ ডেঙ্গু পরিস্থিতি। জাল কিট কেলেঙ্কারির মধ্য দিয়ে সরকার লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে এইডস্, হেপাটাইটিস বি, সি প্রভৃতি মারণ রোগ ছড়িয়েছে। সরকার ক্রিমিনালের মতো মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। হাসপাতালে পরিকাঠামো উন্নত করার প্রশ্ন উঠলেই সরকার বলে টাকা নেই। অথচ টাটা-আম্বানি-সালেম-দের কোটি কোটি টাকা ট্যাক্স ছাড় দিচ্ছে, কৃষকদের জীবন-জীবিকা থেকে উচ্ছেদ করে দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের জমি দিতে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। এরই প্রতিবাদে ৫ নভেম্বর বি সি রায় হাসপাতাল গেটের সামনে বিক্ষোভ দেখায় এস ইউ সি আই। দলের কলকাতা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড চিররঞ্জন চক্রবর্তীর নেতৃত্বে কমরেডস্ ডাঃ কিষাণ প্রধান, ডাঃ বিজ্ঞান বেরা, ডাঃ তিমির দাস, করুণা ভট্টাচার্য এবং অজয় চক্রবর্তী সুপারের কাছে দশ দফা দাবিতে স্মারকলিপি পেশ করেন এবং অবিলম্বে হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নত করার দাবি জানান।

ত্রাণের দাবিতে মথুরাপুরে বিক্ষোভ-ডেপুটেশন

সাম্প্রতিক অতিবর্ষণ ও ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা, সকলের জন্য রেশন কার্ড, ভুলে ভরা গ্রামীণ পরিবার সমীক্ষা রিপোর্ট (২০০৫) বাতিল, সমস্ত গ্রামে বিদ্যুৎ, মৎস্যজীবীদের মাছ ধরার অধিকার, পুলিশ-প্রশাসনের নিরপেক্ষতা, স্কুলস্তরে যৌনশিক্ষা প্রত্যাহার, পঞ্চায়েতে নয়া কর বাতিল প্রভৃতির দাবিতে এস ইউ সি আই-এর মথুরাপুর ২নং ব্লক কমিটির উদ্যোগে গত ২৭ অক্টোবর মথুরাপুর ২নং বিডিও অফিসে সহস্রাধিক মানুষের উপস্থিতিতে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সহদেব নস্করের নেতৃত্বে ১১ জনের এক প্রতিনিধি দল উপরোক্ত দাবিগুলি নিয়ে বিডিও-র সাথে দীর্ঘ আলোচনা করেন। বিডিও দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করে অবিলম্বে সেগুলি কার্যকর করার প্রতিশ্রুতি দেন। বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জেলাসম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সনাতন দাস এবং প্রবীণ জননেতা কমরেড রবীন মণ্ডল। সভায় সভাপতিত্ব করেন কমরেড ব্রজেন নাইয়া।

সাদ্দাম হোসেনের মৃত্যুদণ্ডের প্রতিবাদে ঢাকায় বিক্ষোভ

৫ নভেম্বর ঢাকার রাজপথে কমরেড খালেকুজ্জামান ও কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্তীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের বিক্ষোভ

কিট কেলেঙ্কারি

পূর্ণাঙ্গ তদন্ত দাবি করল হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটি

মানুষের জীবন নিয়ে সরকার যে কত ছিনিমিনি খেলতে পারে, সাম্প্রতিক কিট কেলেঙ্কারি তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। এই ভয়াবহ ঘটনার প্রতিবাদে হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে ৩১ অক্টোবর এক সাংবাদিক সম্মেলন করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি এবং মেডিক্যাল কলেজের প্রাক্তন প্রিন্সিপাল অধ্যাপক ডাঃ অসীম রায়চৌধুরী, সম্পাদক ডাঃ অশোক সামন্ত, অধ্যাপক পান্নালাল ব্যানার্জী, মেডিক্যাল সার্ভিস সেন্টারের সর্বভারতীয় সম্পাদক ডাঃ বিশ্বনাথ পড়িয়া, এবং কলকাতা জেলা সম্পাদক ডাঃ অংশুমান মিত্র।

সাংবাদিক সম্মেলনে বলা হয়, নাগরিক জীবনের প্রতি সরকারি উদাসীনতা ও অবহেলা কত গভীর এবং প্রশাসনিক স্তরে দুর্নীতি কত ব্যাপক হলে 'মনোজাইম ইন্ডিয়া লিমিটেড'-এর কিট কেলেঙ্কারির মত ঘটনা এ রাজ্যে ঘটতে পারে তা ভেবে রাজ্যবাসীর সঙ্গে আমরাও গভীরভাবে আতঙ্কিত ও উদ্বিগ্ন। এই জঘন্য ও মারাত্মক ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি করে আমরা গত ৩০ সেপ্টেম্বর মুখ্যমন্ত্রীর নিকট চিঠি দিয়ে এই কিট কেলেঙ্কারির পূর্ণাঙ্গ তদন্ত দাবি করেছিলাম। সেই সঙ্গে আমরা জানিয়েছিলাম যে, গত দুই বছর যাবৎ কেন্দ্রীয় ব্লাড ব্যাঙ্কসহ সরকারি হাসপাতালে মেয়াদ উত্তীর্ণ জাল কিটে পরীক্ষিত রক্ত লক্ষ লক্ষ মানুষ পেয়েছেন, যাঁরা নিজেদের রোগ নিরাময়ের পরিবর্তে অজান্তেই এইডস্, হেপাটাইটিস বি, সি ইত্যাদি মারণ রোগের শিকার। সম্প্রতি থ্যালাসিমিয়ায় আক্রান্ত শিশুরা যেভাবে অন্য রোগে আক্রান্ত হয়েছে তা অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয় এবং এই ঘটনায় আমরা অত্যন্ত বিচলিত। প্রসঙ্গত, জাল কিট কেলেঙ্কারির তদন্ত চলাকালীন স্বাস্থ্যদপ্তরকে 'ক্লিন চিট' দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতির মাধ্যমে তদন্তকে প্রভাবিত করার ভূমিকা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। আমরা মনে করি, স্বাস্থ্যদপ্তর এবং প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্তাব্যক্তিদের যোগসাজশ ছাড়া শুধু সাধারণ অফিসার ও কর্মচারীরা এই মাপের কেলেঙ্কারি সংঘটিত করতে পারে না। এই পরিস্থিতিতে আমরা মুখ্যমন্ত্রীর নিকট দাবি জানাচ্ছি ঃ

১। কেন্দ্রীয় ব্লাডব্যাঙ্ক সহ সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিতে গত দু'বছরে 'মনোজাইম ইন্ডিয়া লিমিটেড'-এর পরীক্ষিত রক্ত নিয়েছেন এমন সমস্ত মানুষের চিহ্নিতকরণ, পুনরায় পরীক্ষা, চিকিৎসা ও উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব মুখ্যমন্ত্রীকে সাত দিনের মধ্যে ঘোষণা করতে হবে।

২। আগামী এক মাসের মধ্যে 'মনোজাইম ইন্ডিয়া লিমিটেড'-এর জাল কিট কেলেঙ্কারির সি বি আই তদন্ত শেষ করতে হবে এবং এই কোম্পানিকে অবিলম্বে নিষিদ্ধ করতে হবে।

৩। 'মনোজাইম ইন্ডিয়া লিমিটেড'-এর মেয়াদ উত্তীর্ণ জাল কিটের অনুমোদনে লক্ষ লক্ষ মানুষের এইডস সহ আশু ও সুদূরপ্রসারী ক্ষতির নৈতিক দায়িত্ব স্বীকার করে অবিলম্বে স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হবে।

৪। মেয়াদ উত্তীর্ণ জাল কিট কীভাবে 'স্বাস্থ্যদপ্তর ও 'ড্রাগকন্ট্রোল'-এর অনুমোদন পেল এবং কী করে কেন্দ্রীয় ব্লাড ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে কিটের মান ও মেয়াদ চেকিং ইত্যাদি অবহেলিত হল তা রাজ্য সরকারের পক্ষে শ্বেতপত্র প্রকাশ করে রাজ্যবাসীকে জানাতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট সকল দোষী কর্তাব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক সাজা দিতে হবে।

হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির ডেপুটেশন

সরকারি হাসপাতালকে বেসরকারি করার থ্রিপি (পিপিপি) আইন বাতিল, 'হাসপাতাল কমিটি', 'রোগী কল্যাণ সমিতি' গঠন করে চিকিৎসার দায়িত্ব পালন থেকে সরে যাওয়ার প্রতিবাদে এবং ডেঙ্গু ও ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ, স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রয়োজনীয় ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ, রোগীর ও রোগীর বাড়ির লোকজনের নিরাপত্তা, জীবনদায়ী ঔষধপত্র নিয়মিত সরবরাহ প্রভৃতি দাবিতে ১৩ থেকে ১৯ অক্টোবর বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর মহকুমা হাসপাতাল, ওন্দা, কৃষ্ণনগর, সিমলাপবন হাসপাতালের কর্তৃপক্ষকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

১৯ অক্টোবর বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল-এর আউটডোরের সামনে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানেই রোগী এবং তাদের বাড়ীর লোকজনদের অনেকেই সদস্য হন। সেখান থেকে মিছিল করে বাঁকুড়া শহরের মূল কেন্দ্রস্থল বঙ্গবিদ্যালয়ে সমবেত হন জেলার বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ।

১২টার সময় সরকারি নীতির প্রতিবাদে মাচানতলা মোড়ে বক্তব্য রাখেন হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির নেতা ডাঃ বিজ্ঞান বেরা। পরে কমিটির পক্ষ থেকে সংগঠনের সম্পাদিকা লক্ষ্মী সরকার, ডাঃ বিজ্ঞান বেরা, বাঁকুড়া সংগঠনের নেতা ডাঃ তন্ময় মণ্ডল, সদস্য বাবলু চ্যাটার্জী, জাপানী পরামানিক, শিশির ঘোষ সিএম ওএইচ-এর কাছে ডেপুটেশন দেন। ডাঃ বিজ্ঞান বেরা সরকারি নীতিগুলি নিয়ে আলোচনা করেন। ডাঃ তন্ময় মণ্ডল স্থানীয় ক্ষেত্রে খাতড়া হাসপাতালকে কার্যকরী করার ক্ষেত্রে অসুবিধার কথা জানতে চান। কমিটির সম্পাদিকা অন্যান্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের অসুবিধার কথা তুলে ধরেন। কর্তৃপক্ষ কিছু ত্রুটির কথা স্বীকার করেন, তা দূর করার চেষ্টা করবেন বলে জানান। বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ও হাসপাতাল সুপারিন্টেন্ডেন্টকেও ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

কুলতলিতে আমরণ অনশন আন্দোলনের ফলে কর্তৃপক্ষ সকল দাবি মেনে নিয়েছে। বিস্তারিত সংবাদ পরবর্তী সংখ্যায়

নন-রেজিস্টার্ড গ্রামীণ ডাক্তারদের বিক্ষোভ, ডেপুটেশন

৫ অক্টোবর পুরুলিয়া জেলার প্রায় সমস্ত থানা থেকেই গ্রামীণ ডাক্তারেরা উপস্থিত হয়েছিলেন পুরুলিয়া শহরে সিএমওএইচ-এর নিকট বিক্ষোভ ডেপুটেশনে।

অ্যাসোসিয়েশনের পশ্চিমবঙ্গ শাখার সভাপতি ডাঃ ভাস্কর ভদ্রের নেতৃত্বে ডাঃ বলরাম মণ্ডল, ডাঃ উজ্জ্বল আচার্য, ডাঃ সুদর্শন মাজী, ডাঃ জহরলাল কুমার, ডাঃ ডি এন গাঁরাই সিএমওএইচ-এর সঙ্গে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সিএমওএইচ গ্রামীণ ডাক্তারদের উপযুক্ত ট্রেনিং দেওয়ার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করবেন বলে জানান এবং জেলার বাঘমুণ্ডি ব্লকটি গ্রামীণ ডাক্তারদের দায়িত্বে দেওয়ার কথাও ঘোষণা করেন। এছাড়া স্বাস্থ্য পরিষেবার বিভিন্ন বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়। এদিনের ডেপুটেশনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক ডাঃ প্রাণতোষ মাইতি।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩২৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ e-mail : suci_cc@vsnl.net Website : www.suci.in